لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

# THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪ তম বর্ষ ।। ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা

২২শে শাবান, ১৪১৩ হিঃ ।। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৯ বাংলা ।। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

# সূচীপত্র


পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা ( ৫৪তম বর্ষ ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন ( সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ )
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ পরচর্চা ও পরনিন্দা
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৮

সালানা জলসার গুরুত্ব
হযরত মসীহ মাওউদ ( আঃ ) ২৭

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ ঃ
মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ২৯

জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শন
আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী ৩৯

বানী ইসরাঈল জাতির হারানো গোত্রসমূহ ও
উহাদের সন্ধান লাভের প্রচেষ্টা
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল হক ৪৬

তাহ্‌রীকে জাদীদ
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪৮

মুসলেহ্‌ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও আহ্‌মদীয়া জামা'তের কর্তব্য
হযরত সৈয়্যদনা মুস্‌লেহুলমাওউদ ( রাঃ ) ৬১

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যুগ-খলীফার বাণী ৬৩

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের বৈশিষ্ট্যাবলী ৬৪

শান্তির জন্যে শিক্ষা
জনাব মুহাম্মদ সেলিম খান ৬৫

পবিত্র রমযান ও আমাদের করণীয় ৬৮

সংবাদ ৭২

সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ : ১৫ই তবলীগ, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ৩রা ফাল্গুন ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

## কুরআন মজীদ

### সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৫৭। ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ (৩১৯) নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (৩২০) (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবূত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা আর সর্বজ্ঞানী।

২৫৮। আল্লাহ্‌ ঐ সকল লোকের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে; তিনি তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনেন, আর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে 'তাগুত' তাদের অভিভাবক, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকাররাশির দিকে লইয়া যায়? এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে।

রুকূ-৩৪

---

৩১৯। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ধর্মের প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। ইহাতে কেহ ভুল বুঝিতে পারে যে, ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা বুঝি মুসলমানগণকে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছেন। এই আয়াত এইরূপ ভুল বুঝাবুঝির মূলোৎপাটন করিয়া, অতি পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, মুসলমানেরা যেন অমুসলমানদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ না করে। সাথে সাথে, এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, সত্য বিভ্রান্তি হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান। অতএব বল প্রয়োগের প্রয়োজনই বা কি? ইসলাম দেদীপ্যমান সত্য।

৩২০। 'তাগুত' অর্থ সীমা লঙ্ঘনকারী, দানব; যাহারা অন্যকে সত্য ও নেকী হইতে ফিরাইয়া রাখে; সকল দেব-মূর্তি। শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয় (২:২৫৮; ৪:৬১)।

২৫৯। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্‌রাহীমের সহিত তাহার প্রভুর সম্বন্ধে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌ তাহাকে শাসনক্ষমতা দিয়াছিলেন? যখন ইব্‌রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রভু, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন'। সে বলিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই।' ইব্‌রাহীম বলিল, 'বেশ কথা, আল্লাহ্‌ তো সূর্যকে পূর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি'। ইহাতে যে অবিশ্বাস করিয়াছিল সে হতভম্ব (৩২১) হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ অত্যাচারী যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

---

৩২১। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রতিমা ভঙ্গকারী ছিলেন। তাঁহার জাতি সূর্য ও তারকার পূজা করিত; তাহাদের প্রধান দেবতা ছিল মেরোডাক (মাদরুক), যাহাকে আদতে মনে করা হইত প্রভাতের ও বসন্তের সূর্য (এন্‌সাই, বিব এবং এন্‌সাই রিল এথ ২য়, ২৯৬)। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, সকল প্রকারের জীবনই সূর্য-নির্ভর। ইব্‌রাহীম (আঃ) কট্টর অবিশ্বাসীকে বলিলেন, 'বেশ কথা, আল্লাহ্‌ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি।' ইহাতে সে হতভম্ব হইয়া গেল। সে এ কথা বলিতে পারে না যে, সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করার ক্ষমতা তাহার নাই, কারণ এইরূপ উত্তর দিলে, জীবন-মৃত্যুর উপরে তাহার ক্ষমতা রহিয়াছে এই দাবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। আবার এই উত্তরও দিতে পারে না যে, সে সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করিয়া পূর্বদিকে অস্তমিত করিতে সক্ষম। কেননা এইরূপ উত্তর দিলে, তাহার জাতির উপাস্য দেবতাকে অবমাননা করার জন্য সে জাতির কাছে দণ্ডনীয় হইবে। তাই সে বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় বোবার মত চুপ করিয়া থাকিল।

---

(৭ম পাতার পর)

করেন যে, তিনি হযরত মসীহকে মৃত নবীগণের দলে দেখিয়াছেন। এই দুইটি সাক্ষ্য সত্ত্বেও খোদার নিকট হইতে ইসলাম পাইয়া আমি তৃতীয় সাক্ষ্য দিতেছি। যদি আমার জন্য খোদার নিদর্শন প্রকাশ না হইয়া থাকে এবং আকাশ ও পৃথিবী আমার অনুকূলে সাক্ষ্য না দিয়া থাকে, তবে আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি আমার জন্য খোদার নিদর্শন প্রকাশ হইয়া থাকে এবং যুগ আমার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে আমাকে অস্বীকার করা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের ধারালো প্রান্তে হাত রাখার তুল্য হইবে।

আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হইয়াছে। আমার যুগেই দেশে সহীহ হাদীস, কোরআন শরীফ ও পূর্বের কেতাবসমূহ অনুযায়ী প্লেগ আসিয়াছে। আমার যুগেই নূতন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইয়াছে। আমার যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভীতি-প্রদ ভূমিকম্প আসিয়াছে। তাহা হইলে নির্ভিক চিত্তে আমাকে মিথ্যাবাদী না বলা কি তাকওয়ার দাবী ছিল না? (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

# হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

## পরচর্চা ও পরনিন্দা

কুরআন ঃ

و لا تلمزوا انفسكم ( الحجرات ١٢ )

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না। ( হুজুরাত-১২ )

হাদীস ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله
( ترمذى )

অর্থাৎ হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন দোষ-ত্রুটি অথবা গুনাহ্‌র ব্যাপারে তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেই দোষত্রুটি অথবা গুনাহ্‌তে লিপ্ত হয়। (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা :—ইসলাম এক উত্তম সামাজিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করে, সমাজের প্রতিটি ব্যাধিকে মূলোৎপাটন করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সাঃ) বিশেষ করে ঐ সকল ব্যাধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেগুলি পরিণামে গোটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এমনই একটি সামাজিক ব্যাধি হলো পরচর্চা ও পরনিন্দা।

হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে তার ভাইয়ের দোষত্রুটিকে দেখার পর তার সংশোধনের পরিবর্তে তাকে নিয়ে সমালোচনা ও পরচর্চায় লিপ্ত হয়ে যায়। হুযুর (সাঃ)-এর সতর্কবাণী আমাদের জন্য কতই না ভীতপ্রদ! আমাদের সমাজে পরচর্চা ও পরনিন্দা একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের শিক্ষা হলো তোমরা পরনিন্দা না করে দোয়ার মাধ্যমে আচার ব্যবহারের মাধ্যমে সংশোধনে প্রয়াসী হও। নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের আত্মশুদ্ধি কর। এটাই হলো উত্তম পথ। আমরা যদি এহেন হীন কর্মে লিপ্ত হই তাহলে তা আমাদের হৃদয়ের পবিত্রতা, ঐক্য ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহতা'লা আমাদের সবাইকে সর্বদা নেকী ও তাকওয়ার পথে চলার তৌফীক দান করুন।

## হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

# অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

( ১—১২ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর )

এতদ্ব্যতীত, সাহাবাগণের পর এই দাবী করা যে, কোন এক সময় এই উম্মতে এই বিষয়ের উপর ঐক্যমত হইয়াছিল যে, * হযরত ঈসা সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন—ইহার চাইতে বড় মিথ্যা আর নাই। এইরূপ ব্যক্তি, যে সাহাবাগণের পর কোন বিষয়ে ঐক্যমতের দাবী করে, তাহার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের এই উক্তি প্রযোজ্য হয় যে, সে মিথ্যাবাদী।

বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তৃতীয় শতাব্দীর পর বিগত উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং পরস্পর বিরোধী শত শত বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। এমনকি মাহদী আবির্ভূত হইবেন এবং মসীহ আগমন করিবেন—ইহাতেও একটি ব্যাপারে ঐক্যমত নাই। বস্তুতঃ শীয়াদের মাহদী একটি গুহায় গোপন অবস্থায় আছেন এবং তাঁহার নিকট আসল কোরআন শরীফ আছে। তিনি ঐ সময় আবির্ভূত হইবেন যখন সাহাবাগণ (রাঃ)-কে পুনরায় জীবিত করা হইবে। তিনি তাহাদের নিকট হইতে অপহরণকৃত খেলাফতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। সুন্নীদের মাহদীও তাহাদের কথানুযায়ী নিশ্চিতভাবে না কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং না নিশ্চিতভাবে ঈসার যুগে আবির্ভূত হইবেন। কেহ কেহ বলে, তিনি ফাতেমার বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ বলে, তিনি আব্বাসের বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ একটি হাদীসের দরুন এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হইবেন। কেহ কেহ বলে, মাহদীর আগমন নিশ্চয় মধ্যবর্তী যুগে হইবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁহার পরে আসিবেন। এই বিষয়ে তাহারা হাদীস পেশ করিয়া থাকে। কাহারো কাহারো বক্তব্য এই যে, মসীহ ও মাহদী দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তি নহেন; বরং মসীহ ও মাহদী একই ব্যক্তি। এই বক্তব্যের অনুকূলে তাহারা لا مهدی الا عیسی এর হাদীস পেশ করে। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে

---

* টীকা : স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কথাও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্বলিত আয়াত বা বারবার বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে যে, হযরত ঈসাকে প্রকৃতপক্ষে সশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছিল। সুতরাং যাহাকে উঠাইয়া নেওয়া প্রমাণিত নহে, তাহার দ্বিতীয়বার আগমনের ভরসা করা কেবল ব্যর্থ আশা। প্রথমে হযরত ঈসার আকাশে যাওয়া কোন সুস্পষ্ট দলিল সম্বলিত আয়াত বা বারবার বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ কর; নতুবা অযথা বিরুদ্ধাচরণ করা তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী।

কাহারো কাহারো ধারণা এই যে, ইবনে সাইয়্যাদই দাজ্জাল * এবং সে গুপ্ত আছে। শেষ যুগে সে আবির্ভূত হইবে। অবশ্যই ঐ বেচারা মুসলমান হইয়াছিল এবং ইসলামে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং মুসলমানেরা তাহার জানাযা পড়িয়াছিল। কেহ কেহ বলে, দাজ্জাল গীর্জায় কয়েদ আছে, অর্থাৎ কোন গীর্জায় বন্দী আছে এবং অবশেষে সে ইহা হইতে বাহির হইবে। এই শেষ কথাটি তো সঠিক ছিল। কিন্তু আফসোস, ইহার অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইহাকে বিকৃত করা হইয়াছে। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, দাজ্জাল, যাহার অর্থ খৃষ্ট ধর্মের ভূত, তাহা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গীর্জায় কয়েদ ছিল আর তাহাকে নিজের দাজ্জালী প্রভাব বিস্তার করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছিল? কিন্তু এখন শেষ যুগ। সে কয়েদ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইয়াছে এবং তাহার অসুবিধাসমূহ দূর হইয়াছে। কাজেই যতখানি আক্রমণ করা তাহার তকদীরে ছিল সে ততখানি করিয়া ছাড়িয়াছে। কাহারো কাহারো ধারণা যে, দাজ্জাল মানুষ নহে; বরং ইহা শয়তানের নাম। ** কেহ কেহ হযরত ঈসা সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি আকাশে জীবিত আছেন। আবার মুসলমানদের কোন কোন ফেরকা, যাহাদিগকে 'মুতাজিলা' বলা হয়, তাহারা হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী। কোন কোন সুফীর প্রথম হইতেই এই বিশ্বাস যে, আগমনকারী মসীহ কোন উম্মতী হইবেন এবং তিনি এই উম্মতেই জন্মগ্রহণ করিবেন। একটু ভাবিয়া দেখ যে, মসীহ ও মাহদী এবং দাজ্জাল সম্পর্কে এই উম্মতে কি পরিমাণ মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আয়াত كل حزب بما لديهم فرحون (সূরা আল্ রূম: ৩৩) (অর্থ—প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা লইয়া আনন্দিত—অনুবাদক) অনুযায়ী সকলেই নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে সর্বসম্মত মতের দাবী করিতেছে। অতএব, সত্য কথা এই যে, যখন কোন শরীয়তে অনেক মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়া যায় তখন ঐ মতবিরোধসমূহের স্বাভাবিক দাবী

---

** টীকা: এই শয়তানের নাম অন্য কথায় খৃষ্টান ধর্মের ভূত। এই ভূত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে খৃষ্টানদের গীর্জায় কয়েদ ছিল এবং আব্বাসার মাধ্যমে ইসলামের সংবাদাদি অবগত হইতেছিল। তৃতীয় শতাব্দীর পর নবীগণের (আঃ) দেওয়া সংবাদ অনুযায়ী এই ভূত রেহাই পাইল এবং দিন দিন ইহার শক্তি বাড়িতে লাগিল এমন কি হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বড় জোরের সহিত ইহা বাহির হইয়া পড়িল। এই ভূতের নামই দাজ্জাল। যাহার বুঝার প্রয়োজন সে বুঝিয়া লইবে। খোদাতা'লা সূরা ফাতেহার শেষে ولا الضالين দোয়ায় এই ভূত সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন।

* টীকা: ইবনে সাইয়্যাদের হজ্জ করা প্রমাণিত সত্য এবং তিনি মুসলমানও ছিলেন। কিন্তু হজ্জ করা ও মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি দাজ্জাল উপাধি হইতে নিস্তার পান নাই।

এই যে, ঐগুলির মীমাংসার জন্য খোদার পক্ষ হতে কোন ব্যক্তির আসা উচিত। কেননা আদি হইতে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। যখন ইহুদীদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ দেখা দিল তখন তাহাদের জন্য হযরত ঈসা মীমাংসাকারীরূপে আগমন করেন। যখন খৃষ্টান ও ইহুদীদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ বাড়িয়া গেল তখন তাহাদের জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খোদাতা'লার তরফ হইতে মীমাংসাকারীরূপে মনোনীত হইয়া প্রেরিত হন।

এই যুগে পৃথিবী মতবিরোধে ভরিয়া গিয়াছে। একদিকে ইহুদীরা কিছু বলে এবং খৃষ্টানেরা অন্য কিছু বলে এবং অন্যদিকে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ রহিয়াছে। আবার অন্যান্য মোশরেকেরা (যাহারা আল্লাহ্‌র অংশীদারীতে বিশ্বাসী।) সকলের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতেছে। এত নূতন ধর্ম ও নূতন বিশ্বাসের জন্ম হইয়াছে, যেন প্রত্যেক মানুষের এক একটি বিশেষ ধর্ম আছে। অতএব, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী এই সকল মতবিরোধের মীমাংসার জন্য কোন মীমাংসাকারীর আগমন জরুরী দিল। সুতরাং এই মীমাংসাকারীর নাম প্রতিশ্রুত মসীহ ও কল্যাণমণ্ডিত মাহদী রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ বাহিরের বিবাদ মীমাংসা করার দিক হইতে তাঁহার নাম মসীহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং অভ্যন্তরীণ ঝগড়ার ফয়সালার দিক হইতে তাঁহাকে অঙ্গীকারকৃত মাহদী নাম দেওয়া হইয়াছে। যদিও এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র বিধান এত বেশী মাত্রায় ছিল যে, হাদীসসমূহের মাধ্যমে ইহা প্রকাশ করা জরুরী ছিল না যে, এক ব্যক্তি মীমাংসাকারীরূপে আগমন করিবেন, যাঁহার নাম মসীহ হইবে, হাদীসসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ এই উম্মতের মধ্য হইতেই হইবেন। তিনি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে মীমাংসাকারী হইবেন। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যত মতবিরোধ আছে ঐগুলি দূর করার জন্য খোদা তাহাকে প্রেরণ করিবেন এবং ঐ বিশ্বাসই সত্য হইবে, যাহার উপর তাঁহাকে কায়েম করা হইবে। কেননা খোদা তাঁহাকে সত্য নিষ্ঠার উপর কায়েম করিবেন এবং তিনি যাহা কিছু বলিবেন প্রজ্ঞার দ্বারা বলিবেন। নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়ার দরুন তাঁহার সহিত তর্ক করার অধিকার কোন ফেরকার থাকিবে না। কেননা ঐ যুগে বিভিন্ন বিশ্বাসের দরুন বানানো বিষয়ের ছড়াছড়ি হইবে, যেইগুলির বিবরণ কোরআন শরীফে নাই এবং মতবিরোধের আধিক্যের দরুন সকল অভ্যন্তরীণ বিবাদকারীরা বা বাহিরের বিরোধকারীরা একজন মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী হইবে। তিনি আকাশের সাক্ষ্য দ্বারা নিজের সত্যতা প্রকাশ করিবেন, যেমন হযরত ঈসার সময় হইয়াছে এবং তাঁহার পরে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় হইয়াছে। অতএব, শেষ প্রতিশ্রুত ব্যক্তির সময় এইরূপই হইবে।

এস্থলে আল্লাহ্‌র এই বিধানও স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতা'লার পক্ষ হইতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী কোন মহান প্রেরিত পুরুষের আগমন সম্পর্কে হয় ইহাতে নিশ্চয় কোন কোন লোকের জন্য একটি পরীক্ষাও লুকাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ঈসার জন্য ইহুদীদের কেতাবসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, তিনি ঐ সময়ে আগমন করিবেন যখন ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মালাকী নবীর কেতাবে আজ পর্যন্ত মওজুদ আছে। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ইহুদীদের জন্য বড়ই পদস্খলনের কারণ হইল। তাহারা আজও ইলিয়াস নবীর আকাশ হইতে অবতরণের অপেক্ষায় আছে এবং নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, ইলিয়াস নবী প্রথমে অবতীর্ণ হইবেন এবং তৎপর

তাহাদের সত্য মসীহ আগমন করিবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত না ইলিয়াস দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন আর না ঈসা মসীহ আগমন করিলেন, যাহা তাহাদের শর্ত পূর্ণ করিত।

অনুরূপভাবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তওরাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি ইহুদীদের খান্দানে অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের সন্তানের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে এবং তাহাদের ভাইদের মধ্য হইতে তাঁহার প্রকাশ হইবে। বনী ইস্‌রাঈলে আগত সকল নবী এই ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থই বুঝিতেছিলেন যে, ঐ আখেরী নবী বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিবেন। কিন্তু অবশেষে ঐ নবী বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই বিষয়টি ইহুদীদের জন্য ভয়ঙ্কর পদস্খলনের কারণ হইল। যদি তওরাতে সুস্পষ্টভাবে এই কথা লেখা থাকিত যে, ঐ নবী বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে আসিবেন এবং তাঁহার জন্মস্থান হইবে মক্কা এবং তাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাঃ) হইবে এবং তাঁহার পিতার নাম হইবে আবদুল্লাহ্‌, তবে কখনো ইহুদীদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি দেখা দিত না।

অতএব, যে স্থলে এই বিষয়ের জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত মওজুদ আছে যে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে খোদাতা'লার পক্ষ হইতে স্বীয় বান্দাদের জন্য কিছু পরীক্ষাও থাকে, সেস্থলে অবাক হইতে হয় যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের বিভিন্ন ফিরকার হাদীসে প্রতিশ্রুত, মসীহ সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে উম্মতী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও কিভাবে আশ্বস্ত হইলেন যে, নিশ্চয় মসীহ আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হইবেন? পক্ষান্তরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটাই অযৌক্তিক এবং কোরআনী বিধানের পরিপন্থী। * খোদাতা'লা বলেন, قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا (সূরা বনী ইস্‌রাঈল : ৯৪)

(অর্থ: তুমি বল, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি কেবল একজন মানুষ রসূল। অনুবাদক)। অতএব যদি মানুষকে সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া আল্লাহ্‌র বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইত তবে এস্থলে কোরাইশ কাফেরদিগকে কেন অস্বীকারমূলক জবাব দেওয়া হইয়াছিল? ঈসা কি মানুষ ছিলেন না? কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মানুষ। হযরত ঈসাকে আকাশে উঠানোর সময় খোদাতা'লার কি ঐ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ছিল না যে, الم نجعل الارض كفاتا احياء واموتا (সূরা আল্‌ মুরসালাত : ২৬-২৭)

(অর্থ: আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই—জীবিতগণের এবং মৃত গণের জন্যও—অনুবাদক)। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আকাশে উঠা সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হইল তখন ঐ প্রতিশ্রুতি স্মরণ হইল। আল্লাহ্‌র কেতাব সম্পর্কে যাহার জ্ঞান আছে সে খুব ভালভাবে জানে কোরআন শরীফ নিজ বক্তব্য দ্বারা হযরত ঈসার মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বীয় কর্মদ্বারা অর্থাৎ স্বীয় স্বপ্ন দ্বারা এই সাক্ষ্যই প্রদান করিয়াছেন; অর্থাৎ বর্ণনা

---

* টীকা: বারবার বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে যে, ঈসা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। এখন বাকী রহিল 'নযুল' (অবতরণ) শব্দটি। এই শব্দটি সম্মান ও ইজ্জতের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় অমুক সেনাবাহিনী অমুক জায়গায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এই জন্য মুসাফেরকে 'নাযীল' (অবতরণকারী) বলা হয়। অতএব কেবলমাত্র 'নযুল' শব্দের দ্বারা আকাশে মনে করা পহেলা নম্বরের বোকামী।

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

# জুমুআর খুতবা

## হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুৎবার বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদ: মৌলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

তাশাহুদ ও তাআওউয পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা নেসার ৫৯নং আয়াতের তেলাওয়াত করেন।

إن الله يأمركم ان تودوا الامنت إلى اهلها - وإن حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ط إن الله نعما يعظكم به ط إن الله كان سميعا بصيرا ০
(سورة النساء - ٥٩)

অতঃপর হুযুর বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তোমরা আমানত উহার যোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দাও। আর যখন মানুষের ন্যায় বিচারের জন্য তোমাদেরকে নিয়োগ করা হয়, আমি এখানে "নিয়োগ করা" ভাবার্থে বর্ণনা করেছি, আয়াতের অর্থ হলো وإذا حكمتم بين الناس অর্থাৎ যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর। আমি "নিয়োগ করা হয়" অর্থ এজন্যে করলাম যে, পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এই অংশের সংযোগ রয়েছে।

إن الله يامركم ان تودوا الامنت الى اهلها

এই আয়াতের এক অর্থ হলো এই যে, হে প্রশাসক নির্বাচনকারীগণ! যখন তোমরা প্রশাসক নির্বাচন কর, আমীর নির্বাচন কর তখন এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখো যে, তোমরা যেন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন কর। পরবর্তী আয়াতটি আরেক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে অর্থাৎ যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের সম্বোধন করছে। অতএব "নিয়োগ করা"র অর্থ এইভাবে উপরোক্ত আয়াতে নিহিত রয়েছে। সুতরাং অর্থ এই হলো যে, যাদের নির্বাচন করা হয়, যাদের উপর আস্থা রাখা হয়, যাদের যোগ্য মনে করা হয় তারা যদি কোন দায়িত্বে আদিষ্ট হন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ যে, তারা যেন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করেন। إن الله نعما يعظكم به অর্থাৎ আল্লাহ্ কতই না উত্তম উপদেশ দাতা! অত্যন্ত সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন যে, ان الله كان سميعا بصيرا নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

এই বিষয়বস্তুটি বর্ণনা করার পূর্বে বলতে চাই যে, গত খুৎবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ছাড়া নবীদের ইতিহাসে এমন কোন

নবী নেই যাঁকে খোদাতা'লা আমীন (বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করেছেন। যাঁর আমানত ও সততার এত খ্যাতি ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁকে দেখে "আমীন" বলে সম্বোধন করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, হযরত মূসা (আঃ) সম্বন্ধে একটি মেয়ে লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, তিনি "কাওই" (শক্তিশালী) ও "আমীন" (বিশ্বস্ত)। যাই হোক এই দু'টির মধ্যে বড় তফাৎ রয়েছে। কোথায় এমন এক ব্যক্তি গোটা জাতির সাথে তাঁকে ছোট বেলা হতে যৌবন পর্যন্ত এভাবে পরখ করছে যে, তাকে দেখলেই সকলে "আমীন" (বিশ্বস্ত) বলে ডাকত, আর কোথায় এই ঘটনা যে, হযরত মূসা (আঃ) দুই জন মেয়ের মেষ পালকে পানি পান করিয়েছেন আর তারা ঘরে গিয়ে পিতার কাছে বর্ণনা করেছে যে, একজন হৃদয়বান ব্যক্তি আমাদের সাথে এমন (ভালো) ব্যবহার করেছেন। সাথে সাথে (তাদের পিতাকে) এই পরামর্শ দিল যে, তাঁকে আমাদের (কাজের) জন্যে রেখে নাও কাজে আসবে এবং এর সাথে ইহাও বলল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাদের (মেয়েদের) সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্ক কিছুক্ষণের ছিল। সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে একজন মেয়ে সাক্ষ্য দিল এবং এই সাক্ষ্যে হযরত (মূসাকে) বাঁচানোর বিষয়টি ছিল। মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশও ছিল। একটি মেয়ে যখন কোন পুরুষকে চাকুরীর ব্যাপারে তার পিতাকে বলে তখন তার মনে অবশ্যই এই প্রশ্ন উঠবে যে, আমার পিতা কি মনে করবেন যে, লোকটি কেমন, (মেয়েটি) কার ব্যাপারে সুপারিশ করছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে অল্প সময়ের মধ্যে সেই মেয়েটি হযরত মূসা (আঃ)-এর চরিত্রের ব্যাপারে যে অনুমান করেছিল তা এইভাবে উপস্থাপন করল যে, একে ঘরে রাখলে আশংকার কোন কারণ নেই। আমরা তাকে যতটুকু দেখেছি তাতে সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত বলেই মনে হলো। শক্তিশালী অর্থ এই যে, সে নিজ জামানতের হেফাযত করতে সক্ষম। সে এমন দুর্বল ব্যক্তি নয় যে, তার আচরণ ভিন্ন হবে। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি "আমীন" (বিশ্বস্ত) হলেও তার আমানতের উপর কোন ভরসা করা যায় না। এ কথাটিও নিশ্চিত যে, হযরত মূসা (আঃ) এর চরিত্র এত মহানুভবতাপূর্ণ ছিল যে, তা দেখে একটি মেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যে অনুমান করেছিল তা অত্যন্ত সঠিক ছিল যে; অর্থাৎ (হযরত মূসার আচরণ) তাঁর সঠিক পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এতে এই কথা বলা যে, গোটা জাতি হযরত মূসা (আঃ)-এর বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছে তা ঠিক নয়। আম্বীয়া (আঃ) জীবনের সাথে যতটুকু সম্পর্ক তাতে পাওয়া যায় যে, এর বিপরীত অপবাদ দেয়া হয়েছে কিন্তু জাতির সাক্ষ্য (বিশ্বস্ত হবার ব্যাপারে) একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া আর কারও জন্যে দেয়া হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ হযরত ইউসুফ (আঃ)। তিনি যে বাসায় থাকতেন সেই পরিবার হতে তার উপরে বিশ্বাস ভঙ্গের অপবাদ দেয়া হয়েছে, তবে খোদাতা'লার তরফ হতে সেই অপবাদ যে একটি নিছক মিথ্যা তা প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু ইহা পরের কথা। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উপর তাঁর ভাইদের পক্ষ হতেও চুরির অপবাদ দেয়া হয়েছে।

হযরত কৃষ্ণ ( আঃ )-এর উপর তাঁর অনুসারীরা চুরির অপবাদ দিয়েছে এবং তাঁর নাম 'ননী চোর' রেখেছে। সুতরাং আম্বীয়া ( আঃ )-এর উপর অন্যায়ভাবে মিথ্যা ও হৃদয় বিদারক অপবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা ( আঃ )-এর উপর অপবাদ দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে যে,

يايها الذين امنوا لاتكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا -
( سورة الاحزاب - ايت ٧٠ )

( অর্থাৎ ) হে ঈমানদারগণ তোমরা মূসার জাতির ন্যায় হয়ো না। তাদের মত হয়ো না যারা মিথ্যা বলে মূসা ( আঃ )-কে কষ্ট দিত। মিথ্যা অপবাদ দিত; সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ( সেই অপবাদসমূহ হতে ) মুক্ত ( ঘোষণা ) করছেন। অতএব ( অতীতের ) নবীগণের জাতি তাঁদের নবুওয়তের দাবীর পূর্বেই ভয়ানক অত্যাচার করেছিল। অনেক অপবাদ দিয়েছে কিন্তু হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা ( সাঃ )-এর চরিত্র এত স্বচ্ছ-পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল যে, কুরআনে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার জাতিকে বলো :

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله - افلا تعقلون ( سورة يونس ايت ١٧ )

অর্থাৎ আমি এর পূর্বে জীবনের একটি বড় অংশ তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি তোমরা সবাই সাক্ষ্য যে, ছোট হতে ছোট চারিত্রিক কলঙ্কের অপবাদ তোমরা আমাতে দেখার চেষ্টা করো নি। অতএব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিশ্বস্ততা এবং সততা এক উজ্জল, স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে আলোকিত হয়ে আছে যে, এরূপ শান ও মর্যাদা সমগ্র জগতে খুঁজে আপনি দেখুন কোথাও পাবেন না, কোথাও দেখতে পাবেন না। যদিও সকল নবী "আমীন" ও সৎ ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে নবীগণের সাথে যদি হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর তুলনা করেন তাহলে সেখানে যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তা এইরূপ,

رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور
شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا -

অর্থাৎ তুমি এতো সুন্দর ও এতো উজ্জল চেহারার অধিকারী যে, যখন তোমার চেহারার বিপরীতে বৈঠকের প্রদীপটি নিষ্প্রভ মনে হলো।

ইহা তো তুলনার কথা। প্রদীপ তো উজ্জলই হয় কিন্তু যখন প্রদীপ হতে উজ্জলতর অস্তিত্ব প্রদীপের সামনে যখন আসে তখন প্রদীপের আলো ম্লান ও নিষ্প্রভ মনে হবে। ইহা মনে রাখতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় অন্য কোন নবীর বদনাম করা নাউযুবিল্লাহ কখনও উদ্দেশ্য নয়। সবাই স্ব স্ব স্থানে উত্তম ছিলেন।

سب پاک ہیں پیمبر اک دوسرے سے بہتر
لیک از خدائے برتر خیرالورای یہی ہے -

অর্থাৎ সকল পয়গাম্বর পবিত্র একজন হতে অন্য জন ভালো কিন্তু মহামহিমান্বিত খোদাতা'লার সৃষ্টির সেরা তিনিই। সততার যে মান মর্যাদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রে পাওয়া যায় তা সমগ্র পৃথিবীতে খুঁজে দেখলেও কারও মধ্যে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি যার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা একটি ছোট বিষয়। আমি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলাম যে, পুস্তক প্রণয়ন বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে কেননা ইহাও একটি আমানত। আমাকে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য দেশে পুস্তক প্রণয়ন বিভাগ পৃথক নয় বরং ইহা প্রকাশনা বিভাগেরই অন্তর্গত। বাস্তবে এতে কোন যায় আসে না। পুস্তক প্রণয়ন বিভাগ প্রকাশনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হোক অথবা পুস্তক প্রণয়ন বিভাগ পৃথক হলেও দায়িত্ব তো নিজের স্থানে রয়েছে। জামাতী আমানতের ব্যাপারে আমি এখন দু' একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

ইসলাহ ও ইরশাদ অর্থাৎ তবলীগ—অপরের নিকট সত্যকে পৌঁছানো এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্—সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে যেখানে জামাতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে খোদার আশীষে এ বিভাগটির অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আমি যতটুকু পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ করেছি তাতে জানতে পেরেছি যে, দাওয়াত ইলাল্লাহ্ অথবা ইসলাহ ও ইরশাদের সেক্রেটারীদের অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যা এমন রয়েছে যারা এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে, তারা কি? অন্যান্যরা জানেনই না যে, এ পদটি কি? তারা জানেন না যে, তাদের দায়িত্ব কি ও তাদের কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি সকল সেক্রেটারী নিজেদের কর্তব্য বুঝেন, জাগ্রত হন ও তৎপর হন তাহলে পৃথিবীর সকল জামাতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। সেক্রেটারী মালের উদাহরণ দেখুন। সে এমন একজন সেক্রেটারী যে বছরের পর বছর ধরে অত্যন্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে জামা'তের কাজ করে যায়। সেক্রেটারী মালের কথা মনে উঠলেই সাথে সাথে এমন এক ব্যক্তির চেহারা (মনের পর্দায়) ভেসে উঠে যে পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, আমানতের হক আদায়কারী, দিনরাত এই চিন্তায় ব্যস্ত যে, তার বাজেট কিভাবে পূর্ণ হবে। ঠিক এরূপই চিত্র অন্যান্য সেক্রেটারীদের বেলায়ও জামাতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আর এই চিত্র তখনই অর্জন হতে পারে যখন তারা (সেক্রেটারী মালের মত) কাজ করেন। আমি যতটুকু পর্যবেক্ষণ করেছি তাতে এক দুইজন ছাড়া সবাই অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। করাচীর সেক্রেটারী মালের কথা আমার মনে আছে। আমি ছোট বেলা হতে এ পর্যন্ত দেখে আসছি যিনিই সেক্রেটারী মাল হয়েছেন—তিনিই সকালে নিজের অফিসের জন্যে বের হতেন, ও সেখান হতে জামা তের কার্যালয়ে চলে যেতেন, জামাতের অফিস হতে রাত এগারোটা

বারোটায় ঘরে ফিরতেন যে, (গভীর রাত হয়ে যাওয়ার কারণে) তার স্ত্রী ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ত। ইহা এক দুই দিন, এক দুই মাসের ব্যাপার নয় বরং বছরের পর বছর তিনি এভাবে জীবন যাপন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমানতের গুরুত্ব বুঝে এবং সেই দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় সে মনে করে যে, গোটা জীবন কাজ করেও আমানতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছে কিনা এ ব্যাপারে তার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে নিজেই মনে করতে থাকবে এখানে ভুলত্রুটি হয়েছে অমুক জায়গায় অলসতা করেছি, এবং আমি এখন পর্যন্ত এমনভাবে কাজ করতে পারিনি যেমন কিনা আমানতের দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ছিল। এই স্পৃহার সাথে জামাতের কর্মকর্তাগণের পদ মর্যাদা সম্বন্ধে উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। সেই কর্তব্যবোধ অনুযায়ী তাদের হৃদয় জাগ্রত হবে, তাদের অনুভূতি সৃষ্টি হবে, তাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। তারা মনে করতে শুরু করবে যে, ঋণের বোঝা বাড়তে শুরু করেছে। এই চেতনার বোঝা ও তীব্র অনুভূতিই তাদিগকে অগ্রগামী করবে। কিন্তু যদি এই অনুভূতি ও চেতনার সৃষ্টি না হয়, তাহলে তারা দায়িত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকবে যে, তারা কি ও তাদের কি কি করণীয়। ফলে জামাতের কাজ কর্ম পূর্বের ন্যায়ই পড়ে থাকবে। অতএব দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র যে কাজ হচ্ছে তা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং ঐকল আহমদীর কারণে হচ্ছে যারা বিভিন্ন তাহরীকের কারণে নিজেদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে নেন। অনেকেই তবলীগের জন্যে দেওয়ানা হয়ে যান, তারা দিন রাত এই কাজে লেগে যান আর সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদের বেশীর ভাগ কাজ হলো তাদের ফলগুলি প্লেটে সাজিয়ে জামাতের সামনে পরিবেশন করে দেয়া। আসলে সেই বৃক্ষই মূল্যবান ও মর্যাদাবান যে বৃক্ষ এই ফল জন্ম দিয়েছে। সুতরাং আপনারাও সেই বৃক্ষে পরিণত হতে পারেন। প্রত্যেক সেক্রেটারী সেই গাছে রূপান্তরিত হতে পারেন যা ফলদার ও সর্বদা উত্তম ফলদান করতে থাকে। এক ব্যক্তি অল্পই ফল দিতে পারে কারণ তার কর্ম পরিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন এক কর্মকর্তা কর্মঠ হয়, একটি ফলদার বৃক্ষে রূপান্তিত হয় তখন তার প্রচেষ্টায় গোটা জামাত যে ফল দিতে শুরু করে তখন তা তারই ফল হিসেবে বিবেচিত হয়, এমন বৃক্ষে পরিণত হয় যার ছায়ায় গোটা জামাত চলে আসে। তার শাখা প্রশাখা দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ও জামা'তকে কল্যাণ পৌঁছাতে থাকে। এ জন্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও নিজের উদাহরণ এমন এক বৃক্ষের ন্যায় দিয়েছেন যার শাখা প্রশাখা পৃথিবীর দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তার ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম করবে, পাখীরা তার ডালে বসবে, তার ফল হতে মানুষ কল্যাণ পাবে। অতএব সেক্রেটারীগণকে অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে নিজেদের দায়িত্বকে বুঝে এবং এই চিন্তাসহ কাজ করতে হবে যে, তাদের জবাবদিহী করতে হবে। আমীর যদি কৈফিয়ৎ তলব নাও করেন খোদা তো করবেন। এতে আরেকটি কঠিন বিষয় রয়েছে আর তা হলো জবাবদিহীর ভয়ে পালাবারও কোন স্থান নেই কেননা আল্লাহ্‌তালা তাঁর সেবা হতে পালায়নকারীদের পসন্দ করেন না। পদের অনুসন্ধানে, পদের প্রতি লালায়িত

হয়ে এগিয়ে গিয়ে হাত পেতে পদ নেয়া, অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। কাজের ভয়ে পিছপা হয়ে বা পিঠ প্রদর্শন করে খোদার কাজ অন্যের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে পলায়ন করাও ঘৃণ্য কাজ। সুতরাং ইহা এমন আমানত নয় যে, যাতে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে। ইহা সেই আমানত যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিণামের চিন্তা না করেই গ্রহণ করেছিলেন, নিজের আত্মার উপর যুলুম করে এবং ইহা জেনে শুনে যে, ইহা (আমানত) গ্রহণে তিনি অনেক অত্যাচারের সম্মুখীন হবেন তবুও তিনি সেই আমানতকে অর্থাৎ সমগ্র জগতের হেদায়াতের বোঝা উঠানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এবং جهولا এই অর্থে যে, পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেপরওয়া হয়ে গেলেন। এখন তো আমরা তাঁর আমানতের দাস হয়ে এই পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হয়েছি। এই দাসত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করে এই আমানতের বোঝা উঠানো হতে বিরত হতে পারব না। এটা সেই বিষয়বস্তু যদ্দরুন আহমদীয়া জামাতে পদ হতে ইস্তেফা দেয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অশোভনীয় বলে মনে করা হয়। কিছু সংখ্যক লোক লিখে থাকেন যে, আমাকে ক্ষমা করুন আমি এ পদের যোগ্য নই। যোগ্য তো একজনই ছিলেন আর তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। তাঁরই দাসত্বে, তাঁরই অনুগ্রহে সমগ্র জগতকে যোগ্য করা হচ্ছে। তাঁর প্রতিটি সেবককেই কিছু না কিছু যোগ্যতা দান করা হয়, সুতরাং যোগ্যতার বিচার তো খোদাতা'লা করবেন। এখানে যোগ্যতার বিষয়বস্তু শুধু এতটুকু যে, যা কিছু আছে তা নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাও। যতটুকু যোগ্যতা আছে তা পেশ করে দাও। সুতরাং যখন আপনারা ইহাকে আমানতের বিষয়বস্তুর সাথে পড়বেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে, আমানত বিষয়টি কি? আমানতের অর্থ এই নয় যে, তোমার যে ক্ষমতা নেই তা পেশ করো নতুবা খোদাতা'লা তোমাকে পাকড়াও করবেন। মানুষের প্রতিভাসমূহও আমানত। তার সকল প্রতিভাই আমানত। আল্লাহ্‌র আমানতের বোঝা তার উপর ততটুকুই দেয়া হয় যতটুকু প্রতিভার আমানত খোদাতা'লা তাকে দিয়েছেন। অতএব, এই আমানতের সাথে অন্যান্য (বাহ্যিক) আমানতের সাথে একটি যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে, ভারসাম্যতা আছে। এ দু'টির মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তা'লা ন্যায়ের সাথে বিচার করে থাকেন। সুতরাং কারও জন্যে এই সুযোগ নেই যে, তাঁর বিবেক তাকে দংশন করবে যে, তার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তার ক্ষমতার উর্ধ্বে। এজন্যে সে যদি হক্ আদায় না করে তবে সে অপরাধী হবে। এজন্যে ইহা (দায়িত্ব) ছেড়ে দাও। ইহা ছাড়ার অনুমতি নেই। খোদাতা'লার তরফ থেকে যে প্রতিভা তাকে দান করা হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে কেননা ইহা (দায়িত্ব) ছেড়ে দেয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদেরই সমতুল্য। আর কোন মুসলমান এই চিন্তাই করতে পারে না। এটা মনে রাখতে হবে যে, আমানত ক্ষমতা অনুযায়ী হবে। আল্লাহ্‌তা'লা যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন আপনারা ততটুকু কাজ করুন। এতটুকু অবশ্যই করুন এবং

চেষ্টা করুন যে, নিজেদের চেষ্টাকে শেষ সীমানায় পৌঁছে দিন যেন আপনারা আমানতের দায়িত্বে (চেতনায়) পূর্ণ হয়ে যান। আপনাদের অস্তিত্ব এদিক থেকে পূর্ণ হয়ে যাক, যে শূন্যতা ছিল তা পূর্ণতা লাভ করুক। যা কিছু আপনাদের ক্ষমতা ছিল সেই অনুযায়ী সব কিছু আমানতের হক্ আদায় করার লক্ষ্যে পেশ করে দিন। অতঃপর আল্লাহ্‌র হাতে বিষয়টি সোপর্দ করে দিন। আল্লাহ্ তা'লা অনুকম্পাকারী ও ক্ষমতাদানকারী। তিনি জানেন মানুষ দুর্বল, যেখানে যেখানে দুর্বলতা হবে, শূন্যতা থাকবে সেখানে কখনও কখনও আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, আমরা খোদার জন্যে কাজ করেছিলাম কিন্তু আত্মভরিতা দেখিয়েছিলাম, নিজের লোক-দেখানো প্রকৃতিতে আমানতের দায়িত্ব পালনকে দূষিত করেছি। এবং ইহা আমাদের কাজে অনেক বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। এ সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। বিচার দিবসে খোদাতা'লা (এ বিষয়গুলি) যার সামনে তুলে ধরবেন তখন সে জানতে পারবে। সুতরাং এই দ্বিতীয় বিষয়টিতে বিনয়ের সাথে দোয়া করার প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তালা বলেন, প্রত্যেক মানুষকে আমরা এভাবে সৃষ্টি করেছি যে, সে তার কর্মকে নিজ দৃষ্টিতে সুন্দর বলে মনে করে। নিজ আমলকে সুন্দর মনে করে। অতঃপর একদিন খোদার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি অবগত করবেন যে, তোমাদের আমলের অবস্থান কি ছিল। সুতরাং আপনারা যখন সব কিছু করে নিবেন তখনও আপনারা নিরাপদ নন। তবে অবশ্যই ইহা নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর এক প্রচেষ্টা, যার জন্যে নিজের তরফ হতে পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। নিরাপদ স্থানে সে-ই রয়েছে যাকে খোদাতা'লা নিরাপদ আখ্যা দিয়েছেন। আত্মীয়াগণও অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে জীবন যাপন করে থাকেন। তাঁরা বিশ্বস্ত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও যে, আমানতের দায়িত্ব পালনে তাঁরা পূর্ণ চেষ্টা করে থাকেন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দেন তবুও ব্যাকুল থাকেন যে, কোন ত্রুটি তো থেকে যায়নি, কোন দুর্বলতা তো প্রকাশ পায়নি। জামাতের কর্মকর্তাগণ যদি এই প্রেরণার সাথে কাজ করেন তাহলে আমার এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই যে, খোদাতা'লা তাদের সাথে মাগফেরাতের ব্যবহার করবেন। তাদের পবিত্র নিয়্যতসমূহকে স্নেহ ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তাদের কাজকর্মে ও প্রচেষ্টায় অস্বাভাবিক কল্যাণ দান করবেন। যেখানেই এরূপ কিছু সংখ্যক সেবক প্রেম ও নিষ্ঠার সাথে জামাতের সেবা করে তারা অবশ্যই কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। আমি এখানকার (ইংল্যাণ্ডের) এক মেয়ের কথা উল্লেখ করছি, যাকে আল্লাহ্‌তা'লা ফল দান করছেন। সে বেসকল ইংরেজ মেয়েদের মুসলমান বানিয়েছে তাদের মধ্যে তার মতই নিষ্ঠা, বিনয়, ধর্মের জন্যে উদ্দীপনা এবং অপরের নিকট পয়গাম পৌঁছে দেবার উদ্যম পরিলক্ষিত হচ্ছে। দু'দিন পূর্বে ইংল্যাণ্ডের এক জামাতের এক যুবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার সাথে একজন নতুন আহমদী ছিল। তার চেহারা হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, সে নিষ্ঠাবান ও

জামাতের প্রেমিক এবং ঈমানের উদ্দীপনা তার চেহারায় উদ্ভাসিত দেখা যাচ্ছিল। আমি ইহা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, সে (সাথের যুবকটি) তার তৈরীকৃত আহমদী। যার তবলীগে আহমদী হয়েছে, সে-ও একজন নবীন যুবক। অল্প বয়সের। সে বলল, আমি একজনকে নয় আপনি যখন বার্মিংহামে গিয়েছিলেন তখনও আমি সেখানে একজনকে পেশ করেছিলাম। সে-ও (বয়াতকারী) খোদার আশিসে অনুরূপ (নিষ্ঠাবান)। আমি যখন আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম তখন জানতে পারলাম যে, এই যুবকটির পিতা আহমদী হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আহমদীয়াত হতে দূরে সরে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, অথবা তার বুযুর্গ দাদার দোয়া অথবা মায়ের দোয়া হবে যা তার পক্ষে গৃহিত হয়েছে যে, সকল সন্তানই খোদার ফযলে নিষ্ঠাবান আহমদী। কিন্তু এ যুবকটি দাওয়াত ইলাল্লাহ্ হয়ে গেছে। এত অল্প বয়সে, যৌবনে এই নিষ্ঠা যে অর্জন করে নেয় তার উপর আল্লাহ্র বড় কৃপা আর যারা ইহা অর্জন করতে পারে না তাদের জন্যে চিন্তার বিষয় যে, তারা কেন ইহা অর্জন করতে পারে না। তোমাদেরকেও খোদাতা'লা অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। তোমাদিগকে খোদাতা'লা সেই শক্তি দান করেছেন যে শক্তিকে খোদার জন্যে ব্যবহার করলে ফল লাগতে পারে (অর্থাৎ নতুন বয়আত হতে পারে।) এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি আহমদীকে অন্ততঃ ইহা জানা উচিত যে, তাদেরও যোগ্যতা আছে। ইহা তো স্বীকার করতেই হবে। ইহা হতেই পারে না যে, কোন আহমদী ইহা বলবে যে, যোগ্যতা নেই এজন্যে তারা অপারগ। সবারই যোগ্যতা আছে। এ জন্যে আপনাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জিজ্ঞেস করা হবে। একশতের (বয়াত করানোর) ক্ষমতা না হলে দশ জনের তো হবে। দশ জনের না হলে এক জনের তো হবে। এক বছরে এক জনকে (আহমদী) করতে না পারলে কয়েক বছরে এক জনকে তো (আহমদী) করতে পারবেন। যোগ্যতা তো অবশ্য আছে। আমি ইহা মেনে নিতেই পারি না যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাগানের কোন বৃক্ষ বন্ধ্যা হতে পারে। নিজে বন্ধ্যা হতে চাইলে অন্য কথা, কিন্তু যোগ্যতার দিক হতে আপনাদিগকে সেই যোগ্যতা দেয়া হয়েছে যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথীদের দেয়া হয়েছিল। যাদের খোদাতালা "رِجَال" (রেজাল) নামে অভিহিত করেছেন। রেজালুন শব্দটি তাঁর (সাঃ) দাসদের জন্যে। এরা তারাই যাদের সঙ্গীরা "রেজাল"। সেই আয়াতটি হলো এই যে, رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ (النور: ٣٧)। "رِجَال" (রেজালুন) এর অর্থ হলো যার মধ্যে সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা রয়েছে। শুধু পুরুষ অর্থই নয়। কেবল সাধারণ মানুষই নয় আর এখানে লিঙ্গ বিশেষের বিতর্কও নেই। বরং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সকল দাস যদিও বা তারা পুরুষ হোক অথবা নারী, আধ্যাত্মিক দিক হতে তারা সবাই "রেজাল"। তাদের মধ্যে মরিয়মের গুণাবলী ছিল। কারও সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁরা অগ্রসর হতে জানতেন। "রেজাল" শব্দটি, "মরিয়মী গুণাবলী"রই প্রতিফলন তা এই অর্থে মু'মেনের জন্য প্রযোজ্য হয় এবং মুমেনাত (মহিলা মুমেন) এর জন্যেও প্রযোজ্য হয়। তাই কুরআন মজীদে মুমেনদের তুলনা

মরিয়মের সাথে করা হয়েছে যদিও বা তা পুরুষ মুমেন হোক অথবা মহিলা মুমেন হোক। সুতরাং আপনারা যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাস হয়ে থাকেন তাহলে খোদাতা'লা বলছেন যে, তোমাদের মধ্যে এই যোগ্যতা অবশ্যই আছে, আপনারা অগ্রসর হতে পারেন। অগ্রসর হতে দেখানো হয়েছে। আপনাদের মধ্যে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। তাহলে আপনারা কেন অগ্রসর হচ্ছেন না। এই দৃষ্টিতে যদি সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ নিজ নিজ জামাতের পর্যবেক্ষণ করেন এবং খোদার সিংহদের জাগ্রত করার চেষ্টা করেন এবং প্রতিমাসে এই উদ্বিগ্নতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন যে, এমাসে কত জন নতুন আহমদী হয়েছে, যাদের মাঝে নিজ যোগ্যতার ব্যাপারে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। তারা দণ্ডায়মান হয়েছে (তবলীগের জন্যে), তাদের অন্তরের গৌরব জাগ্রত হয়েছে, (অর্থাৎ অপরকে আহমদী বানানোর স্পৃহা)। তারা রেজালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং খোদার ফযলে কাজ করতে শুরু করেছেন। যদ্দরুন তারা অবশ্যই অগ্রসর হবেন, বর্ধিত হবেন ও ফল দান করবেন। ইহা হলো সেই মূল দায়িত্ব যা সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদকে পালন করতে হবে। তার কাজ ইহা নয় যে, যারা তবলীগ করে তাদের ফলসমূহ একত্রিত করে নিজ রিপোর্টের প্লেটে সাজিয়ে পেশ করেন। আর কথা মনে করে নেয় যে, আমার কাজ উত্তমরূপে সম্পাদিত হলো। এ কাজ তো একজন পোষ্টম্যানের। সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদের কাজ তো তাই যা আমি এতক্ষণ বর্ণনা করেছি। এই তথ্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্বও তার যে, সেই সমাজে কোন্ ধরনের লোকের বসবাস, কত ধর্মের লোক সেখানে থাকে। সেখানে কত জাতির বসবাস। যখন হতে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেছি আমি এই সবের প্রতি দৃষ্টি রেখে এমন কি কাজ করেছি যদ্দরুন আমি পূর্বের চেয়ে অধিকতর ব্যক্তিদের নিকট আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছে দিতে পেরেছি অথবা নিজ গোত্রের লোকদের তুলনায় ভিন্নধর্মালম্বীদের নিকট জামাতের পয়গাম পৌঁছাচ্ছি কি-না। সমাজে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তাদের নিকট পয়গাম পৌঁছানোর জন্যে আমি কি করেছি। শ্রেণীভেদের যে কথা বলছি তাতে দেখুন শুধু শিক্ষকদের সংখ্যা উন্নত দেশে এতো রয়েছে যে, যদি কোন সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ শুধু এই শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে খোঁজ নেয় যে, এ ব্যাপারে আমি কি চেষ্টা করেছি, কতটুকু শূন্যতা রয়েছে, কি কি হতে যাচ্ছে, সে যদি এই চিন্তা করে তো কেঁপে উঠবে। হাজার হাজার সংখ্যায় স্কুল শিক্ষক রয়েছে। ইংল্যাণ্ডেই আমার মনে হয় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক হবে। একটি বিরাট সংখ্যা রয়েছে, আমার সঠিক অনুমান নেই বিধায় কেবল পঞ্চাশ হাজারের উপর ভিত্তি করবেন না। আমি এটা জানি যে, বিরাট সংখ্যায় রয়েছে। এত বড় সংখ্যায় যে, এক একজন আহমদীদের মাঝেও যদি এদের (শিক্ষক) ভাগ করেন তবে একজনের ভাগে কয়েকজন শিক্ষক পড়বে। এত কাজ পড়ে আছে যে, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদকে অনুসন্ধান করে, খোদার নিকট দোয়া করে বিনয়ভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো শুরু করতে হবে। এই শ্রেণীকে জামাতের প্রতি টেনে আনার কোন পন্থা বের করতে হবে। তাদের

লক্ষ্য করে কিছু প্রচার পত্র তৈরী করুন বা তৈরী করান। তাদের জন্যে জামা'তের নিকট কি কি আছে তাদের তা বলুন। উপদেশের কোন পয়গাম পাঠান। এটা আবশ্যকীয় নয় যে, সরাসরি ডেকে আনাকেই তবলীগ বলে। তবলীগের অর্থ হলো পৌঁছানো। আর পৌঁছানোর অর্থ হলো প্রত্যেক ধরনের নেকীর কথা পৌঁছানো। তাই তো আম্বীয়া আলায়হেস সালাম শুধু এই দাওয়াত দিতেন না যে, এসো আর আমাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও বরং পুণ্যের কথা বলতেন এবং তাঁরা পুণ্য বন্টন করতে থাকতেন।

আজকাল স্কুলে যে ধরনের মন্দ কর্মের বিস্তার ঘটছে, কয়েক ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ সেখানে সংঘটিত হচ্ছে এবং পরবর্তী বংশধরদের ধ্বংসের জন্যে তা ওঁত পেতে বসে আছে। সে সম্বন্ধে একজন আহমদী দরদের সাথে প্রচার পত্র তৈরী করুক, প্রকাশনা সেক্রেটারীর তা পসন্দ হলে এটিকে উলামাদের দেখিয়ে সন্তুষ্টি লাভের পর তা ছাপিয়ে শিক্ষক-দের মাঝে বিতরণ করা হউক। এরূপ হলে অন্ততঃ এই পয়গাম তো পৌঁছবে যে, তাদের কিছু সংখ্যক এমন শুভাকাঙ্খী রয়েছে যারা তাদের শুভাকাঙ্খী হয়ে উপদেশ দেয়। সমাজের সংশোধনের অবশ্যই এই অর্থ নয় যে, তারা আহমদী মুসলমান হয়ে যাবে। ইসলামী রীতি-নীতির নিকটবর্তী হয়ার নামও ইসলাম। যখন এই সকল রীতি-নীতি বাস্তবায়িত হতে থাকে তখন এর অভ্যন্তরীণ প্রভাব মানুষকে সেই ধর্ম গ্রহণ করায় যে ধর্মের রীতি-নীতি হতে সে লাভবান হয়েছে। সুতরাং নবীগণের ইতিহাস আমি কুরআন করীমে যতটুকু পড়েছি তাদের (তবলীগের) ধরনও এইরূপই ছিল। ইহাই তাদের রীতি ছিল। ইহাই তাঁদের সুন্নত ছিল যে, পুণ্যকে ছড়িয়ে দিতেন। আর যেখানে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সেখানে পুণ্যের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যকীয়। পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের দিকে আহ্বান করা ভর্তি করার নাম মাত্র। আর এর কোন কল্যাণও নেই। সুতরাং এই দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদিগকে ঐ সকল তথ্যাদি পৌঁছে দিন, যার প্রয়োজন তাদের রয়েছে। ইহাও তবলীগের এক পদ্ধতি। আরও অনেক কাজ পড়ে আছে। প্রকাশনা বিভাগ যে সকল বই পুস্তক প্রকাশ করে থাকে এগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয়া যেখানে প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব, সেখানে ইসলাহ্ ও এরশাদ-এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব ইহাও যে, মোবাল্লেগীনের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, তাদের কোন্ কোন্ (জ্ঞানের) অস্ত্রের প্রয়োজন এবং তা তাদের নিকট পৌঁচাচ্ছে কি-না। তাদের কোন্ কোন্ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তারা সেগুলোর উত্তর জানেন কি-না? কোথায় কোথায় ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে ষড়যন্ত্র জন্ম নিচ্ছে এবং কোন্ কোন্ পন্থায় নিষ্ঠাবান আহমদীদের ঈমানের উপর ডাকাতি করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। বিভিন্ন দায়ী ইলাল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা ছাড়া তাদের জন্যে দোয়া করতে হবে। ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তার বিভাগের কাজে গত বছরের তুলনায়

কতটুকু উন্নিত হয়েছে। যদি গত বছর একশত আহমদী হয়ে থাকে তাহলে এ বছর কতজন আহমদী হয়েছে। আগামী বছর কতজনকে আহমদী বানানোর যোগ্যতা রয়েছে। এ ব্যাপারেও অসাধারণ সততার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন কি-না আমি পূর্বেও উদাহরণ দিয়েছি যে, কতিপয় লোক এরূপ দাবী করে থাকেন যে, হুযুর দোয়া করুন একশত আহমদী যেন হয়ে যায়। এরপর তারও প্রেরণ করতে শুরু করেন যে, হুযুর একশত আহমদী যেন বানাতে পারি সে জন্যে দোয়া করতে শুরু করে দিন। অপরদিকে তার অবস্থা এই যে, গোটা বছর তবলীগের জন্যে বিন্দু মাত্রও প্রয়াস চালান না।চুপ করে বসে থাকেন। যখন সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তখন বলতে শুরু করেন যে, এখনও একশত আহমদী হয় নি। এমন ব্যক্তি রয়েছে যারা ক্রমাগত দশ বছর ধরে এই অঙ্গীকার করে আসছেন আর প্রত্যেক বছরের শেষে পত্রও লিখতে শুরু করেন ও তার প্রেরণ করে থাকেন। কিন্তু দশ বছরে একটিও আহমদী বানান নি। এরূপ ব্যক্তির একশত আহমদী বানানোর অঙ্গীকার করার অধিকার আছে কি? একশত (আহমদী বানানোর) এত উচ্চ আকাঙ্খা পোষণ করার হক্ তার নেই। সততার সাথে কাজ নিন। ন্যায় পরায়ণতার সাথে কাজ করুন। যতটুকু সামর্থ্য আছে তদনুযায়ী চেষ্টা করুন। অতএব, যোগ্যতা নির্ণয় করাও তো একটি বড় কাজ। দাওয়াত ইলাল্লাহ্ র সেক্রেটারী এবং ইসলাহ ও ইরশাদের সেক্রেটারী যদি পৃথক পৃথক হয়ে থাকেন তাহলে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করে এবং যদি একই ব্যক্তি দুই বিভাগের দায়িত্বে থাকেন তাহলে অন্যান্য সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করে যোগ্যতা নির্ণয় করা প্রয়োজন। যোগ্যতার নিরূপণ শুধু সংখ্যা দ্বারা সম্ভব নয় যে, এতজন আহমদী রয়েছে তাই এতজন আহমদী অবশ্যই হতে হবে। যোগ্যতার নিরূপণ এ দ্বারাও সম্ভব নয় যে, কতজন কতজনকে (আহমদী বানানোর) অঙ্গীকার করেছে। যোগ্যতার নিরূপণ তো এভাবে সম্ভব যে, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ অথবা সেক্রেটারী দাওয়াত ইলাল্লাহ্কে সকল আহমদীদের যোগ্যতা নির্ণয় করতে হবে। যারা গত দু' চার বছরে এক দুইজনকে বয়াত করিয়েছেন তাদের যোগ্যতা বাড়াতে হবে। এটাই প্রকৃত যোগ্যতা। যারা নতুন অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের যোগ্যতা নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হবার নয় বরং তাদের দোষত্রুটি দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। তাদের প্রতিভাসমূহকে এভাবে জাগ্রত করতে হবে যে, নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে, তারা এখন বেশ কয়েকজনকে আহমদী বানাতে পারবে। একেই বলে যোগ্যতা নিরূপণ করা। শুধু এই রিপোর্ট লিখে দেয়া যে, আমরা দশ হাজার আহমদী (বানানোর) ওয়াদা করছি এবং আমরা তা বানিয়ে ছাড়বো (ইহা যথেষ্ট নয়)। শেষে দেখা যায় যে, পাঁচ বা দশজন হয়েছে। আর এই ফলও তাদের যারা পূর্ব হতে কাজ করছে। এই অবস্থাকে সামনে রেখে আমীরগণের উচিত যে, তারা যেন সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদের সাথে আলোচনা করেন, তারা যেন আলোচনা করেন যখন থেকে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তারা কি চিন্তা করেছেন। কি করেছেন, এর ফলশ্রুতিতে

জামাতের মাঝে কি ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তারা কতটুকু জাগ্রত হয়েছে। উদ্দীপনা ও জাগ্রত করার বহু পদ্ধতিও রয়েছে। যারা ভালো কাজ করছেন তাদের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন কিনা আমি ইংল্যাণ্ডের দু'টি উদাহরণ দিয়েছি। পৃথিবীতে এমন বহু উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ার দেশসমূহে অনেক এমন নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন যারা অত্যন্ত উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইহা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, খোদাতা'লা জামাতকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। ইহা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পয়গামে শক্তি রয়েছে। পয়গামে আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রয়েছে। যদি কোন মানুষ এরূপে কাজ করতে চায় তাহলে সে অবশ্যই পারবে। আমেরিকায় নিউইয়র্কের বাচ্চাদের সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণনা করেছি কি-না মনে নেই; কিন্তু তাদের তবলীগে দিন দিন তাদের সহপাঠিরা আহমদী হচ্ছে। এমন নিষ্ঠাবান আহমদী হচ্ছে যে, তাদের উপর মাতাপিতা ও সমাজের পক্ষ হতে চাপ রয়েছে তথাপি তারা এ সবের বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না।

এপ্রসঙ্গে আপনাদের সামনে একজন দায়ী ইলাল্লাহ্‌র উল্লেখ করছি যার শহীদ হওয়ার খবর আজ পাওয়া গেছে। গুজরাওঁয়ালাতে আমাদের এক দায়ী ইলাল্লাহ্‌ ছিলেন যাঁর নাম মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব মেহর। গুজরাওঁয়ালা জেলার ঝেহুলানের অধিবাসী তিনি। ১৯৮৪ সনে তিনি নিজেই আহমদী হন যুবক বয়সে। অধিক বয়স ছিল না তখন তাঁর। খুব শীঘ্রই আহমদীয়তে উন্নতি করেছেন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র উন্মাদনা তার মাথায় চেপেছিল। আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল। অনেক দেরীতে আমাকে লিখেছেন যে, আমি তো আমার প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চলা ফেরা করি। সমগ্র এলাকা জীবনের শত্রু। আর রক্তের পিপাসু হয়ে আছে। নিজের ঘর অর্থাৎ আমার বিবি-বাচ্চারা ব্যতিরেকে আমার আত্মীয় স্বজনেরা কেউই আমার নয়। আমার কারও পরওয়াও নেই। আমি তো ঐ কাজেই মগ্ন আর দিনরাত তাঁর এই কাজই ছিল। কাল রাতে তাঁর ওপর নেহায়েৎ হৃদয় হীন ও নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। প্যারা মেডিকেল নামে এক সংগঠন আছে। তিনি যেহেতু এর নায়েব কাসেদ তাই ডাক্তারীও কিছু জানতেন। এক যুবক রুগীর বেশে আসলো। পরে বললো, আমি পুনরায় আপনার নিকট আসবো। পরে সে অন্য এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে তাঁর ঘরে আসলো এবং এক ব্যক্তির মিথ্যা ঠিকানা দিলো। তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর কথা কেউ শুনলে তিনি তার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। ঐ ব্যক্তি কেবল এতটুকু বল্‌লো, আমিও এক প্রকার গুপ্ত আহমদী। এতেই তাঁর ওপর প্রভাবান্বিত হলেন তিনি। এক আহমদীর সাথে সাক্ষাৎ করানোর জন্যে অন্য এক গ্রামে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলো। তিনি জানতেন যে, যে গ্রামের নাম বলা হয়েছে ঐ গ্রামে এ নামে কোন আহমদী নেই। তিনি যখন তাকে ধরে ফেললেন। তখন সে বললো, না, না, আমি পার্শ্ববর্তী স্থানের এক লোক। যাই হোক নিজের সরল হৃদয়ের জন্যে আর

তবলীগের প্রেরণার কারণে তাকে বললেন, হ্যা, আবারও এসো। পরে সে আর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসলো। রাতে তিনি অতি আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে তার আরামের ব্যবস্থা করলেন। খাবার জন্যে বল্লেন। সে বল্লো, এখন থাকুক। পরে দু'জনেই সেখানে পেট পুর্তি করে খেল। রাতে শোবার ২/১ ঘন্টা পরে তারা তাঁর মাথা ও মুখের ওপর পিস্তলের গুলি চালালো এবং তাঁর ছেলের ওপরও। আর যে পর্যন্ত রক্ত গরম ছিল তিনি তার পিছনে দরওয়াজা পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। কিন্তু সেখানে যেতেই পড়ে গেলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু আহত ছেলেটি বেঁচে গেল। তাঁর স্ত্রীও খুব বাহাদুর এবং খোদার ফযলে একজন নির্ভীক দায়ী ইলাল্লাহ। তাঁর ছেলেদেরও এই অবস্থা। ঐ সময়েই মা ছেলেকে ত্বরিৎ পাঠালেন যে, ঐ বদবখতদের একজনকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী যে গ্রামে গিয়েছিলে সেখানে গিয়ে সংবাদ দাও। যখন ঐ ছেলে খবর দিল তখন তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন শহীদের ছেলে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলতে লাগলো, আপনাদের কি হয়েছে? আমার পিতা তো উত্তম পরিণতির দিকে পৌঁচেছেন। বহু সাহসী ছিলেন তিনি। আমাদের কোন চিন্তা নেই। খোদা আমাদের অভিভাবক। আর আমাদের মাতাও এ ব্যাপারে বড়ই খুশী যে, খোদার জিনিষ, খোদার আমানতে পৌঁছে গেছেন আর বাহাদুরীর সাথে বিশ্বস্ততার সাথে তিনি সত্যতার ওপরে প্রাণ দিয়েছেন। সুতরাং এ রকম দায়ী ইলাল্লাহও রয়েছে যারা জীবনের বাজী রাখেন এবং মনে করেন যে, "হক তো ইয়েহ্ হ্যায় কেহ্ হক্ আদা নাহ্ হুয়া" অর্থাৎ সত্যতো ইহাই যে, দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হলো না

জামাতে ইনশাআল্লাহ্ শহীদগণের কোন সন্তান-সন্ততি এতীম থাকতে পারে না। এতীমদের কোন চিন্তা নেই। সারা জগৎ তো আল্লাহ্তা'লারই হাতে। ইহা যদি কারও পৃষ্ঠপোষকতা করে তো তারা কি ভাবে এতীম হবে। এ বাহাদুরী সত্ত্বেও প্রিয়দের নিকট থেকে বিচ্ছেদ, এমন নিকটতম প্রিয়দের নিকট থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার দুঃখ তো একবারে দূর হতে পারে না বরং এমন দুঃখ যা সময়ের সাথে বেড়ে যায়। এখন আঘাত তাজা, এখনও আন্দাজ করা যায় না। সময়ের সাথে সাথে তার বিচ্ছেদের অনুভূতি কমতে থাকবে আর অভাবের অনুভূতি বাড়তে থাকবে। সম্ভবতঃ তারাও এখন সরাসরি আমার খুতবা শুনে থাকবে। রাবওয়াবাসীদের তরফ থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যেসব চিঠিপত্র আসছে তা থেকে ধারণা করা যায় যে, লোকেরা খুব উৎসাহের সাথে খোতবাগুলোতে উপস্থিত হচ্ছে আর মনে করছে যে, আমাদের দেখার পিপাসা তো কিছু না কিছু মিটে যাচ্ছে। নৈকট্যের ছোঁয়াচ কিছু না কিছু তো পাওয়া যাচ্ছে। এতে জামাতের তবলীয়তের মধ্যেও উন্নতি হচ্ছে। ঘরে ঘরে যেখানে আগে টেলিভিশনে অন্যান্য প্রোগ্রাম দেখার উৎসাহ ছিল এখন জানা গেছে যে, লোকেরা উৎসাহের সাথে এন্টিনা (Antennas) লাগাচ্ছে আর বিশেষ করে ডিস লাগিয়ে নিজেরাও খুতবাতে যোগদান করছে এবং সাথে সাথে পাড়া প্রতিবেশীদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছে। কোন কোন

পরিবারের লোকেরা কোন কোন ঘরে নিজেরা এন্টিনা লাগিয়েছে। এই পদ্ধতি সারা দুনিয়াতে শুরু হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারাও সামনে বসে আছে। সম্ভবতঃ আজ তাঁর জানাযাও হয়েছে। আমি তাদেরকে প্রীতিপূর্ণ সালাম পৌঁচাচ্ছি। আমি আমার তরফ থেকে এবং সমগ্র দুনিয়ার জামাত থেকেও তাদেরকে মোবারকবাদ দিতেছি যে, আল্লাহ্‌তালা বড়ই সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। এমন সৌভাগ্য প্রদান করেছেন যার ফলে বিচ্ছেদের ব্যথা থাকা সত্ত্বেও আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি অবশ্যই হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া উচিত। বড়ই সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি যে এরূপ শান ও মর্যাদার সাথে শির উঁচু করে খোদার রাস্তায় নিজের গর্দান পেতে দেয়। আর তাঁর বিধি-বাচ্চারাও কত বরকত লাভের যোগ্য! কত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী! এ দুঃখের সময়, শোকের সময়ও সৌভাগ্যের ওপর দৃষ্টি রেখেছেন ক্ষতির ওপর দৃষ্টি দেননি আর যা কিছু রেখেছেন তার চেয়েও বেশী পাওয়ার অনুভূতি আসে যা এ সময়ে তাদেরকে ভরসা দান করেছে। যা খুইয়েছেন তাকে নিতান্তই সাধারণ মনে করছে। আল্লাহ্‌তালা তাদের সব কাজ সুসম্পন্ন করে দিন। তাদের সব বোঝা তিনি বহন করুন। তাদের অভিভাবক, তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হউন এবং এই শাহাদতে খোদাতা'লা বহু ফুল-ফল দিন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের একটি কবিতা আছে যা খোদার বান্দাদের ফুল ও ফল লাগার সাথে সম্পর্কিত:

"ওহ্ বরগুযিদাহ্ শাজার লড় রাহা হ্যায় মওসুম সে
কেহ্ ফুলনা থা উসে বরগ্ ও বার দেনা থা"

অর্থাৎ ঐ মনোনীত বৃক্ষ ঋতুর সাথে লড়াই করছিল যে শাখা-প্রশাখা ফুলে-ফলে বৃদ্ধি পেত। আহমদীয়াতের মনোনীত বৃক্ষ তো ঋতুর সাথে লড়াই করতেই থাকবে। একটি শাখা কেটে নিলে, একটি ফুল তুলে নিলে কি বৃক্ষটিকে মেরে ফেলতে পারবে? তুমি খুবই মূর্খ! ইহা তো ঐ বৃক্ষ যা খোদা নিজ হস্তে রোপণ করেছেন, ইহা ঋতুর সাথে ঐ ভাবেই লড়াই করতে থাকবে। ইহা তো মনোনীত বৃক্ষ। ইহা ফুল দেবে। ইহা ফলবান হবে। ইহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করবে—করতে থাকবে।

সুতরাং আমানতের দায়িত্ব পালনকারীদের ইহা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রাণও একটি আমানত। আমাদের দায়িত্ব পালন করতে যদি জীবনও যায় তাহলে এই বিষয়টি এখানে প্রযোজ্য হবে:

"জান দী দী হুই উসী কি থী
হক্ তো ইয়েহ্ হ্যায় কেহ্ হক্ আদা নাহ্ হুয়া"

অর্থাৎ প্রাণ দিলাম যা তাঁর দেয়া প্রাণই ছিল, সত্য তো ইহাই যে, সঠিভাবে দায়িত্ব পালন করা হল না।

অতঃপর এই প্রেরণার সাথে যদি কোন আহমদী নিজের কর্তব্য পালন শুরু করে দেয় তো দেখুন দুনিয়ার ওপরে খোদাতা'লার ফযলে কিভাবে শীঘ্র শীঘ্র আল্লাহ্‌তালা তাঁদের প্রভাব

সৃষ্টি করেন, তাদেরকে উৎকর্ষতা দান করেন। তাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করেন আর যখন খোদাতা'লার পক্ষ থেকে কোন কর্মীর ওপর দৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে তখন সে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পেয়ে যায়। আর যখন খোদাতা'লার স্নেহের দৃষ্টি কোন বৃক্ষের ওপর পড়ে তখন অবশ্যই উহা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। এরূপ বৃক্ষ বন্ধ্যা থাকতে পারে না। সুতরাং যারা কর্মকর্তা তারা যেন এ রূপে কাজ করে। তারা ঐ নিয়্যতেই কাজ করে যে, আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি, তাঁর স্নেহের দৃষ্টি তাদের ওপর যেন পড়তে আরম্ভ করে। কর্মী যেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এরূপ ভাবে কাজ করে যেন উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমার প্রভুর ভালবাসা এবং প্রশংসার দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে থাকবে। দেখুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কত ভালবাসা ও কত মধুর বচনে বার বার বলেছেন,

"সুব্‌হানা মান্ ইয়ারানী, সুব্‌হানা মান্ ইয়ারাসী"

অর্থাৎ যিনি আমাকে দেখেন তিনি পবিত্র, যিনি আমাকে দেখেন তিনি পবিত্র।

আমার কি চিন্তা। ঐ সত্তা আমার প্রিয়—অতি পবিত্র। আর বহু উচ্চে, যিনি সর্বাবস্থায় আমাকে দেখেছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি তাঁর স্নেহের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেন না। এরূপ ব্যক্তির কাজ কিভাবে বিফল হতে পারে। তিনিই একজন যাঁর থেকে আজ কোটিতে পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় যাঁর নামের ডঙ্কা বাজছে। যাঁর সুনাম যমীনের কিনারে গিয়ে পৌঁচেছে। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে। যদি উহা খোদার স্নেহের পাত্র হয়ে যায়, ঐ যোগ্যতার ওপর যদি খোদার স্নেহের দৃষ্টি পড়তে শুরু করে তাহলে তা অবশ্যই চমকাবে। অবশ্যই উৎকর্ষ লাভ করবে। অবশ্যই ফুল ও ফল দেবে। আমানতের হক্ এভাবে আদায় করার চেষ্টা করুন তবে দেখবেন খোদাতা'লা কিভাবে আপনার সাথে ভালবাসা ও স্নেহের ব্যবহার করেন। আর সারা দুনিয়ায় অতি ক্ষিপ্রতার সাথে আহমদীয়াতের পয়গাম বিস্তারিত হতে শুরু করবে।

আরও একজন শহীদের উল্লেখ আমি করতে চাই। তিনি হলেন, মোবাশ্বের আহমদ চৌধুরী। কানু এষ্টেটের মোবাল্লেগ। এই মোবাল্লেগ সাহেব নাইজেরিয়ার কানু এষ্টেটে তবলীগের কর্তব্য পালন করছিলেন। তাঁর ব্যাপারে আজই সংবাদ পাওয়া গেছে যে, নিজের কয়েকজন বন্ধুর সাথে গাড়ীতে করে তবলীগি সফরে কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় গাড়ী এক গর্তে পড়ে যায় আর সেখানেই আমাদের প্রিয় ভাই মোবাশ্বের আহমদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাথী দু'জন আহত হন। কিন্তু আল্লাহ্‌তালার ফযলে তাদের অবস্থা বিপদমুক্ত। তিনি প্রথমতঃ এ অর্থে শহীদ যে, দেশের বাইরে যে সব মোবাল্লেগই ধর্মের জন্যে বের হন এবং ধর্মের সেবার অবস্থায় প্রাণ দেন নিঃসন্দেহে তাঁরা শাহাদতের উচ্চ মাকাম লাভ করেন। কেবল তলওয়ার দ্বারা লড়াই করলেই শহীদ হয় না। যিনি খোদার খাতিরে নিজের বিবি-বাচ্চাকে পরিত্যাগ করে নেহায়েৎ দুর্বিপাকে, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ধর্মের সেবার জন্যে

বিচ্ছিন্ন স্থানে বের হন, আর ঐ স্থানে যদি মৃত্যু আসে তবে অবশ্যই তিনি শহীদদের মধ্যে গণ্য হবেন। দ্বিতীয়তঃ যে স্থানে যে সফরে যে অবস্থায় তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন তা বিশেষ করে তাবলীগি সফরই ছিল। তৃতীয়তঃ যে কারণটি শাহাদতের মধ্যে তাঁর মাকাম ও মর্তবাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে তা হলো এই যে,, আমীর সাহেব লিখিতভাবে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন, এক বছর পূর্বে আমাকে শহীদ মোবাশ্বের এ কথা বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে লিখেছেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন মোবাশ্বের সাহেবকে কাফনের কাপড়ে জড়িয়ে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়েছে।

অতএব যা হয়েছে তা নির্ধারিত ছিল। আমরা এতে সন্তুষ্ট। আমাদের অনেক প্রিয়, প্রেমিক, বহু খেদমতকারী ভাই আমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন বরং একজন নয় দু'জন ভাই আজ বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। তাঁদের বিচ্ছেদ ব্যথা অবশ্যই আছে কিন্তু ঐ কথাই সত্য যা আমাদের প্রভু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

"বোলানেওয়ালা হ্যায় সব সে পেয়ারা
উস্ পে আয়ে দিল তু জান ফিদা কার।"

অর্থাৎ আহ্বানকারী তো সব থেকে প্রিয়, হে প্রাণ! তুই বিলীন হয়ে তাঁর দিকে আয়।

এই দুই শাহাদতকে সামনে রেখে নিজেদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করুন যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরা তাদের একটি বাণী রেখে গেছেন আর ঐ বাণী ইহাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সামর্থ্য ছিল নিজেদের সর্বশক্তি এ রাস্তায় আমরা নিয়োজিত করেছি এখন খোদা আমাদেরকে ডেকে নিয়েছেন তাই এখন আমাদের বেশী কিছু করার শক্তি নেই! ওহে! আমাদের স্থলাভিষিক্তগণ! তোমরা তোমাদের সময়ের মূল্য দাও। দেখবে খোদা তোমাদেরকে অনেক কিছু করার সৌভাগ্য দান করবেন। নিজের সমস্ত শক্তি এ পথে নিয়োজিত কর যেন যেভাবে আমি মরার সময় খোদার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম আর খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্টি ছিলেন। তোমরাও এভাবে প্রাণ উৎসর্গ করো যেন তোমরা খোদার প্রতি সন্তুষ্ট থাক আর খোদা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। সুতরাং এ প্রেরণার সাথে যদি জামা'ত দুনিয়াতে কাজ করে তাহলে দেখবে কত শীঘ্র দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। দুনিয়ার অবস্থা তো খুবই কলুষতাপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, লোকেরা উপদেশ থেকে উপকৃত হয় না। তারা আমানতের খেয়ানত করে, কিন্তু চিন্তা করে না যে, খোদার নিকট জবাবদেহী করতে হবে আর কি ভাবেইবা জবাব দেবে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবহিত আছেন। এর উপর আমি পূর্বে একটি খুতবায় পরিষ্কারভাবে আলোকপাত করেছিলাম যে, সরকার এই ঘটনার সঙ্গে অবশ্যই জড়িত আছেন এবং সরকারই ইহার জন্যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ঘটনাটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল। ওখানে যখন কিছু সংখ্যক লোককে বিষয়টি জ্ঞাত করা হ'ল,

তখন তারা বল্লো, ইহার প্রমাণ কি (যে, সরকার এতে জড়িত)। আমরা বল্লাম, যা কিছু আমরা আপনাদিগকে পূর্বে বলেছি, ওখানে কি হচ্ছে এবং কি হতে যাচ্ছে, এসবই স্বয়ং এর প্রমাণ। তদুপরি, সরকারের প্রতিক্রিয়াও স্বয়ং ইহার প্রমাণ যোগাচ্ছে। আমরা এখন যে তথ্য প্রাপ্ত হয়েছি উহা নিঃসন্দেহে ও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করছে যে, এতে সরকার জড়িত আছেন। আমাদের জামা'ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সরকারের নিকট যখন প্রতিবাদ জানিয়েছে যে, আপনাদের চোখের সামনে একটি দেশ তার রাজনৈতিক আওতার বাইরে গিয়ে সেখানে এমন অন্যায় কাজ করছে যেখানে রাজনীতির কোন সম্পর্কই নেই, বরং নিজের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে যুলুম করছে, সেখানে জাতিসংঘ ও আপনাদের দায়িত্ব ইহাই যে, যুলুমকারী দেশের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন এবং তাদিগকে বুঝান যে, তারা যেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রের ভিতরে থাকেন এবং সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন একটি বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের জাতীয় সংসদ-সদস্য তাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আমাদের জামা'তের প্রতি আকর্ষণ করলে, উত্তরে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) লিখে পাঠালেন যে, যেসব কথা আপনি বর্ণনা করেছেন তা সবই ঠিক। তদুপরি তিনি অতিরিক্ত আরো কিছু বিষয় ব্যক্ত করছেন। জামা'তে আহমদীয়ার ক্ষতি সাধন এবং উহার উপর আক্রমণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে যে সংবাদটি ছিল উহা অপেক্ষা অনেক স্পষ্ট তথ্য তিনি তাঁর রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বা যারা এই দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের মাধ্যমে পূর্বেই প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং বাংলাদেশের ধর্মমন্ত্রী সেই বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বিবরণ ও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কোন প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, সরকার অবশ্য কেবল জড়িতই নয় বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছেন যে, আমরা এরূপ করবোই করবো, অর্থাৎ শুরু হতেই সরকার এই চাল চালিয়ে রেখেছে। (যাকে ধর্ম বিষয়ে মন্ত্রী বলা হয়, বস্তুতঃ তিনি ধর্মীয় ফিৎনা ফাসাদের মন্ত্রী। যেখানে যেখানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী আছেন, আপনি নিঃসন্দেহে বলতে পারেন যে, তিনি ধর্মীয় ফিৎনা-ফাসাদের মন্ত্রী। যেখানে ধর্মীয় ফিৎনা ফাসাদ বিস্তার করার প্রয়োজন নেই, সেখানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীর প্রয়োজন হতে পারে না। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যাকে ধর্ম মন্ত্রীরূপে মনোনীত করা হয়। ফিৎনা বিস্তার করা ছাড়া তার কোন মূল্য ও দায়ি-দায়ত্ব থাকে না। সে দেশের ফিৎনা-ফাসাদের এই মন্ত্রী)

আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেবল পরামর্শই দিতে পারি। অতি দুর্বল মানুষ। আমি এমন একটি জামা'তের নেতা, যার নেতা অপেক্ষা আমি একজন নগণ্য সেবক মাত্র। আমার সমস্ত সম্মান এই জামা'তের সেবক হবার মাঝেই নিহিত। এইজন্য আমি মনে করি যে, আমার কথা হয়তো তাঁর উপর এমন কোন প্রভাব বিস্তার করবে না, যার ফলে সাদরে ও বিনীতভাবে তিনি আমার পরামর্শটি গ্রহণ করবেন। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে,

কোন সত্য কথা ও সৎ উপদেশ সাদরে ও বিনীতভাবে গ্রহণ করা গ্রহণকারীর জন্যই কল্যাণ-জনক হয়। আমার নিকট কোন শক্তি নেই যার বলে আমি আমার কথা আপনাকে উপলব্ধি করাতে পারি বা আপনার অন্তরে প্রবিষ্ট করাতে পারি। আমি বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র-প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, অনেক অতীত ও দূরের ইতিহাস নয় বরং নিকটের ইতিহাসের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং দেখুন যারাই আহমদীয়া জামা'তের সঙ্গে এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছে এবং কি দুর্দশাই না হয়েছে। তাদের এরূপ ভয়াবহ পরিণতি ঘটাতে কি আহমদীয়া জামা'তের কোথাও কোন সামান্যতম হস্তক্ষেপ ছিল? বাহ্যদৃষ্টিতে, আহমদীদের চেষ্টার ফলে কি তারা এরূপ মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছেন যার উল্লেখ আমি এখন করতে যাচ্ছি? মোটেই না। আহমদীদের সাথে কেবল এতটুকু সম্পর্ক অবশ্যই ছিল যে, তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে এবং খোদাতা'লা স্বয়ং ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের জন্যে এক শিক্ষণীয় উপদেশ, এক দৃষ্টান্তমূলক পয়গাম উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আহমদীদের সাথে এরূপ অন্যায়-অত্যাচার কর, তাহলে তোমাদের সঙ্গেও এরূপই ব্যবহার করা হবে।

সর্বপ্রথমে আমি আমীর ফয়সাল (সউদী আরবের বাদশাহ)-এর সাথে ১৯৭৩ইং সালে যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার উল্লেখ করছি। ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সুযোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণপূর্বক জামা'তে আহমদীয়াকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্যে সার্বিক সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ভুট্টো সাহেবের সাহস বৃদ্ধি হল। তাঁর কি পরিণতি হল? এ স্থলে প্রশ্ন জাগে, ইতিপূর্বে কি কখনও কোন সউদী রাষ্ট্রনায়কের এরূপ পরিণতি হয়েছে? ইহা কোন সাধারণ পরিণতির বিষয় নয় বরং ইহা অস্বাভাবিক ও অসাধারণ পরিণতির একটি বিষয় বটে। অতঃপর ভুট্টো সাহেবের পালা আসে। তাঁকেও আমি একদা ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি বুঝেন নি। জানি না কিরূপে তিনি কার চাপে পড়ে গেলেন। তিনি যে হৃদয়বিদারক পরিণতির সম্মুখীন হলেন, তা সর্বজনবিদিত। প্রশ্ন জাগে, পাকিস্তান সরকারের কোন রাষ্ট্রনায়কের কি ইতিপূর্বে এরূপ পরিণতি হয়েছে? অতঃপর আসে জিয়া সাহেবের পালা। তাঁকে অবশ্য আমি এরূপে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করিনি। কিন্তু খুৎবার মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে গোটা বিশ্বকে শুনিয়ে সতর্ক করেছি যে, দেখ! ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই এরূপে করবে যে, খোদার বান্দাদের উপর যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন করবে বিধাতার বিধান ও নিয়তি তাকে কখনো বিচার না করে ছাড়বে না। অবশ্যই তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিশান বানিয়ে ছাড়বে। মোট কথা আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, গত রাতে খোদা আমাকে পুনরায় বলেছেন যে, এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলছে। আমি

আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনার সঙ্গে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। পরবর্তী খুৎবা আসার পূর্বেই আকাশে তাঁর বিমানটি বিস্ফোরিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই তার সকল অহংকার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিমানটি এমনিভাবে টুকরো টুকরো হলো যে, যথাতথা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

এমন অস্বাভাবিক তিন—তিনটে ঘটনা ঘটে গেল। এদের মধ্যে একটিতেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ তিন ব্যক্তি এমন যে, তারা আগাগোড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে অমুসলিম ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদি তাঁরা প্রথম শ্রেণীর মুজাহেদ হতেন, যদি খোদার খাতিরে খোদার দীনের খাতিরে এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর ভালবাসায় বিভোর হয়ে এ কাজ করে থাকতেন, তাহলে কেমন যালেম খোদা তিনি যিনি প্রত্যেক এমন কর্ম সম্পাদনকারীর হাত কেটে দিচ্ছেন, মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছেন এবং তাঁদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যে ব্যবহার ইতিপূর্বে সৎ লোকদের সংগে তিনি কখনও করেননি। এই সকল লোক বিধাতার অসাধারণ বিধান ও নিয়তির বিকাশস্থল হয়ে গেছেন। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের ইতিহাসে কখনও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ককে ফাঁসী দেয়া হয়নি। পাকিস্তানের কোন রাষ্ট্রনায়কের বিমান আকাশে এইরূপে কখনও বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়নি। সউদী আরবের কোন বাদশাহ এইরূপে কখনও নিজের প্রিয় জনের হাতে এত লাঞ্ছিতভাবে নিহত হননি। সুতরাং যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে, তিনি তিনকে চার করতে চান, অর্থাৎ এই অর্থে তিনি স্বাধীন তাকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না, কিন্তু মনে রাখবেন যে, খোদার নিয়তিকে কেউ রদ করতে পারবে না। আপনি যা চান তাই করুন; খোদার নিয়তি অবশ্যিই আপনার পশ্চাদ্ধাবন করবে; আপনার বিচার না করে ক্ষান্ত হবে না। ইহা একটি বিনীত পরামর্শ মাত্র। ইহা এই অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী নয় যে, খোদা আমাকে নির্দিষ্টভাবে আপনার সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি যে, আমি তিনটি ঘটনার আলোকে নিঃসন্দেহে এমন একটি অকাট্য ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, আপনাকে অনেক ইস্তেগ্‌ফার ও তওবা করা উচিত। অরপনি নিজ দেশকে এমন বিপদাবলীর দিকে ঠেলে দিবেন না যেসব বিপদাবলী এইরূপ নির্যাতন করার পর পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাকে তৌফীক দান করুন এবং বাংলাদেশের গরীব মুসলমানদের সহায় হউন।"

---

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

# সালানা জলসার গুরুত্ব

"মনে ইহা চায় দীক্ষিতগণ যেন শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরে সফর করে আসেন
আর নিজেদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন
সৃষ্টি করে ফিরে যান

—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

"এ জলসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইহা ছিল যে, আমাদের জামা'তের লোক যেন কোন রূপে বার বার সাক্ষাৎ ও মিলনের দ্বারা নিজেদের মধ্যে এমন এক পরিবর্তন লাভ করেন যার ফলে তাঁদের অন্তর আখেরাতের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে যায় এবং তাঁদের মধ্যে খোদাতা'লার ভয় ও ভীতির সৃষ্টি হয়, তাঁরা যেন সংসার নির্লিপ্ত, তাক্‌ওয়া, খোদা-ভীরুতা পরহেযগারী, নম্রতা ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃস্নেহে অপরাপর সকলের জন্যে এক নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যান। বিনয়, নম্রতা ও অমায়িকতা এবং সত্যপরায়ণতা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এবং মহান ধর্মীয় কার্যাবলী ও অভিযানে প্রাণচঞ্চল ও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।'

"মনে ইহা চায়, দীক্ষিতগণ যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে সফর করে আসেন এবং আমার সাহচর্যে থাকেন এবং কিছুটা (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) পরিবর্তন সৃষ্টি করে ফিরে যান। মৃত্যুর কোন ভরসা নেই। আমাকে দেখার মধ্যে দীক্ষিতদের কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু আমাকে প্রকৃতপক্ষে সে-ই দেখে যে ধৈর্য সহকারে দীনের অন্বেষণ ও অনুসরণে আত্মনিয়োজিত হয় এবং একমাত্র দীনের অনুসারী হয়ে যায়; সুতরাং এইরূপ পবিত্র লোকদের আগমনই সর্বদা উত্তম।"

"এ জলসা এমন নয়, যেমন দুনিয়ার মেলাগুলো অনর্থক। ইহার অনুষ্ঠান বাধ্যকর হয়, বরং ইহার অনুষ্ঠান মহব্বত, সৎ নিয়্যাত এবং উত্তম ফলরাশির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল .....আমি কখনও চাই না যে, সাম্প্রতিককালের কোন কোন গদ্দীনশীন পীরযাদাদের ন্যায় শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর ও জৌলুশ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমার বয়াতকারীদের একত্রিত করি, বরং সেই মোক্ষম উদ্দেশ্য, যার জন্য আমি উপায় ও পন্থা অবলম্বন করি তাহলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির।

"আমি দোয়া করি, এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিনই দোয়া করতে থাকবো যে, খোদাতা'লা যেন আমার এই জামা'তের লোকদের হৃদয়কে তাঁর রহমতের পবিত্র হাত বাড়িয়ে তাদের অন্তরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেন, এবং সকল প্রকারের অনিষ্টকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তাঁদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলেন এবং পরস্পরের প্রতি সত্যিকার প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, এ দোয়াসমূহ কবুল হবে এবং খোদা

তা'লা আমার দোয়া ব্যর্থ হতে দিবেন না। অবশ্য, আমি এ দোয়াও করি যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার জামা'তে খোদাতা'লার জ্ঞান ও আকাঙ্খা অনুযায়ী চির হতভাগ্য বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে যার পক্ষে সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদা-ভীরুতা হাসিল হওয়া আল্লাহ্‌র তকদীরে একেবারেই নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে হে কাদের ও সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি তাকে আমা হতে ফিরিয়ে দাও যেরূপে সে তোমা হতে ফিরে গিয়েছে এবং তার স্থলে অন্য কাউকে আনয়ন কর, যার অন্তর নম্র এবং যার প্রাণে তোমার অন্বেষা ও স্পৃহা আছে।.....আমি চাই না যে, কেহ দুনিয়ার কীটবৎ থেকে আমার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করুক।"

(মযমুয়ায়ে ইস্তেহারাত: ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৯-৪৪৬)

## জলসার উদ্দেশ্যাবলী

(১) "এই জলসার অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন মুখোমুখিভাবে ধর্মীয় কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার ঘটে এবং ঈমান ও মা'রেফতে (তত্ত্বজ্ঞানে) সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে"।

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্যকল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই মহতী জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়েছে।"

(ইস্তেহার: ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ ইং)

## ইসলামের বিজয়ের সাথে জলসার গভীর সম্পর্ক

সালানা জলসার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে, সারা "জগদ্ব্যাপী দীনে-ইসলামকে জয়যুক্ত করার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ও পন্থাবলী যেন সুচিন্তিতরূপে উদ্ভাবন করা হয় এবং সেগুলোকে কার্যে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।"

## জলসায় আজীবন প্রতি বৎসর উপস্থিতির জন্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের তাকিদ

"যতদূর সম্ভব সাধারণ (সালানা জলসার) নির্ধারিত তারিখগুলোতে উপস্থিত হওয়ার জন্যে ভবিষ্যতে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন এবং মন ও প্রাণের দৃঢ়সংকল্প সহকারে (প্রতিবারই) উপস্থিত হতে থাকুন।"

(আসমানী ফয়সালা: ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯২ইং)

---

## আরো একটি শুভ সংবাদ

বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য আরো একটি শুভসংবাদ এই যে, উপগ্রহের মাধ্যমে (ডিস এন্টিনা দ্বারা) তাদের জন্যে ২৯/১/৯৩ তারিখ থেকে খলীফাতুল মসীহ রাবে'র (আইঃ) জুমআর খুতবা সরাসরি লণ্ডন মসজিদ থেকে সম্প্রচার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের আহমদীরা তাদের প্রিয় ইমামের খুতবা (জীবন্ত) সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে দারুত তবলীগের হল রুমে বসে দর্শন করে এবং শুনতে পায়।

মসীহে মাওউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী আজ সেটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তাঁর খলীফার মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।

লণ্ডন থেকে এই অনুষ্ঠান আহমদীরা মুসলিম টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি ওখানকার সময় বেলা এক ঘটিকায় প্রচারিত হয়ে এক ঘন্টার বেশী সময় জারি থাকে। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

—এ, টি, চৌধুরী

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

## ৬৯ তম সালানা জলসা

(১০,১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী, '৯৩)

# ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ

আশ্‌হাদু আন্‌লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহ্‌ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্‌, আম্মাবা'দু, ফাআউযুবিল্লাহে মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন,আর রাহমানির রাহীম, মালেকে ইয়াউমিদ্দীন ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়া কানাসতাঈন, ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন্‌ আমতা আলায়হিম, গায়রিল মাগদুবে আলায়হিম ওয়ালাদ্দাল্লীন। (আমীন)।

**প্রিয় ভাই ও বোনেরা,**

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় আবার আমরা সালানা জলসায় মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করায় তাঁরই দরবারে হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি। সবাইকে সানন্দ স্বাগতম এবং বাংলাদেশের সব ভাই বোনদের বিশেষ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

**১৯৯২ সালঃ**

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বীজ রোপিত হয়। নানা চড়াই উতরাই পাড়ি দিয়ে এবং ক্রমবর্দ্ধমান রূপ নিয়ে এই জামা'ত ১৯৯২ সালে পা বাড়ায় ও বৎসরটি অতিক্রম করে। সময়ের মহাসাগরে এই সনটি শুধু বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নয় বরং সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। এর প্রধান কারণ হলো ধর্মান্ধ উগ্রবাদীদের মসজিদ ও মন্দির আক্রমণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে এসবের ধ্বংস সাধন। সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা–হাঙ্গামায় স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদম সন্তানদেরকেও [সব ধর্মের লোকই আদমের সন্তান] রেহাই দেয়নি। এমন কি তাদেরকে নির্বিচারে আহতই নয় হতও করা হয়েছে। যারা ধর্মের নামে এসব জঘন্য কাজ করে ও যারা

এসবে উস্কানি দেয় ও সমর্থন জোগায় তারা অন্যদের ক্ষয় ক্ষতি যতই করুক না কেন নিজেদের ধর্মের যে অপূরণীয় ক্ষতি করে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। পরিতাপের বিষয় হলো ধর্মীয় অন্ধত্বের দরুন তারা তা দেখতে পায় না। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, বিশ্ববাসী কোন ধর্মেরই দাবীদারদের বাস্তব আচার আচরণের ভিত্তিতেই তাদের ধর্মের আদর্শ, সৌন্দর্য ও মানবতা বোধের মূল্যায়ণ করে থাকে। বর্তমানে সর্ব ধর্মের ধর্মান্ধ উগ্রবাদীরা 'মৌলবাদী' নামে পরিচিত। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের মৌলবাদীদের জঘন্যতম আচরণই ১৯৯২ সালের ইতিহাসকে কলংকিত করে রেখেছে। ১৯৯২ সালের [illegible] ফেব্রুয়ারী খুলনাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার সালানা জলসা ছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ঐ দিন ভোরে একদল 'মৌলবাদী' যাদের ভাষায় 'তৌহিদী জনতা' আল্লাহু আকবার ও ইসলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে নিরালায় অবস্থিত আহমদীয়া কমপ্লেক্স আক্রমণ করে। এতে আগুন লাগিয়ে অনেক ধর্মীয় কিতাবাদি পোড়ায়, কিছু বই লুট করে নিয়ে যায়। ঢিল ছুঁড়ে গাড়ীসহ ঘর দোরের ক্ষতি করে। কয়েকজন আহতও হয়। ধর্মের নামে রাজনীতি করে এমন একটি রাজনৈতিক দল এবং স্থানীয় উলামাদের একাংশ যারা এসব করেছে তাদের পক্ষ নিয়েই কথা বলেছে। অবশ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকায় সন্ত্রাসী 'ধার্মিকরা' ইসলামের নামে ভয়াবহ আর কিছু করতে পারেনি। টাকার অংকে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল লক্ষাধিক। তখনই যদি সরকার ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের আচার আচরণের প্রতিরোধ করার এবং জনগণকে এর সুদূর প্রসারী অমঙ্গল সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থা নিতেন তবে পরবর্তীতে হয়তো জঘন্যতর ঘটনাগুলো এড়ানো যেত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে দেশে যে অবাঞ্ছিত, অযৌক্তিক ও অইসলামিক আন্দোলন চলছে এর প্রধান দু'টো দিক হলো–১৯৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ বাংলা তরজমা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা ও এই জামা'তকে সংখ্যালঘু অমুসলমান ঘোষণা করার দাবী। এই জামা'তের বিরোধিতা হয়ে আসছে বহুদিন থেকে। তবে ইদানিংকালে উপরোক্ত দু'টি দিক ক্রমাগত প্রাধান্য ও বিস্তার লাভ করে। আমাদের প্রকাশিত কুরআন পাকের তরজমা ও ব্যাখ্যা বাজেয়াপ্ত করার জন্য খুলনাতে একটি কেইসও করা হয়। সুখের বিষয় যে, এই কেইসকে উপলক্ষ্য করে অ–আহমদী কিছু ভাই সাময়িক পত্র–পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখে জোর প্রতিবাদ জানায়। বাদ–প্রতিবাদ তীব্র হতে থাকলে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিনিধিগণ আমাদের এবং বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষাৎকার নেন। ওসব তারা তাদের পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেন। এমনকি একটি জাতীয় পর্যায়ের সাপ্তাহিকীতে উভয় পক্ষের কথা দীর্ঘ আটমাস যাবৎ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীরা জনসভায় উস্কানীমূলক বক্তৃতা, বিবৃতি, বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকাদি ছাপিয়ে তাদের আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলে। তাছাড়া তারা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। এ সবের ফলশ্রুতিতে ২৯শে অক্টোবর, (১৯৯২) ৪নং, বকসীবাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাংলাদেশস্থ প্রধান কার্যালয়ে, পবিত্র ইসলামের নামে ও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে যে দানবীয় কাণ্ড ঘটানো হয়েছে (শুনতে পাচ্ছি এর চেয়েও মারাত্মক কিছু করার পাঁয়তারা চলছে) তাতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সত্য, এর চেয়ে এই জঘন্য অপকর্মের দ্বারা শতগুণ

ক্ষতি করা হয়েছে পবিত্র ইসলামের। এতে করা হয়েছে কলংক লেপন। ক্ষতি করা হয়েছে এ দেশেরও। কেননা আমাদের সম্পদ দেশেরই সম্পদ। মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছে দেশের সুনামেরও। অস্থিরতা, বিশৃংখলতা সৃষ্টি করে দেশের উন্নয়নের গতিকেও করা হচ্ছে মন্থর।

আন্দোলনকারী তথাকথিত তৌহিদী জনতা ২৭শে নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে দিন দুপুরে মাইকযোগে ঘোষণা দিয়ে রাজশাহীতে আমাদের নির্মাণাধীন কমপ্লেক্সকে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয় ও মালপত্র লুট করে নেয়। এরও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা। এসব বিষয়ে পত্রিকাদিতে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমরা এখানে আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। ২৬শে ডিসেম্বের, ১৯৯২ ঢাকার পার্শ্বে কেরাণীগঞ্জেও ধর্মীয় কোন্দলে ২ জন নিহত ও সহায় সম্পদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। জঘন্যতম ঘটনা ঘটে ভারতের অযোধ্যায়। ৬ই ডিসেম্বর সেখানে উগ্রমৌলবাদী হিন্দুদের একটি দল বাবরী মসজিদের ধ্বংস সাধন করে সেখানে রামমন্দির স্থাপন করে। এর প্রতিক্রিয়াতে ভারতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় দেড় হাজারের মত লোক নিহত এবং প্রচুর সম্পদের ক্ষতি হয়। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার সাথে সাথে পাকিস্তানেও হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলে এবং তাদের মন্দিরাদি ধ্বংস করা হয়। বাংলাদেশেও উগ্রবাদী তথাকথিত 'তৌহিদী জনতা' প্রতিক্রিয়া দেখাতে পেছনে পড়ে থাকেনি। তারা হিন্দুদের উপাসনালয় ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে। কোন অবাঞ্ছিত, অকল্যাণকর কাজের প্রতিবাদ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে তা কিছুতেই ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়া অনুচিত। বাবরী মসজিদের ব্যাপারে মুসলমানরা যদি কোন ধ্বংসাত্মক কাজ না করে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করতো, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতো তবে দুনিয়াময় ইসলাম ও মুসলমানদের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হতো। তাতে ভারতের উগ্রবাদীদের নগ্ন চেহারা বিশ্বের দরবারে আরও প্রকট হয়ে দেখা দিতো।

নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে বাবরী মসজিদ পুনঃ নির্মাণের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশে উলামাদের নেতৃত্বে 'তৌহিদী জনতা' লংমার্চ করে অযোধ্যা যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তাতে ৫ জনকে পুলিশের হাতে জীবন দিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহ অতিক্রম করার পূর্বেই ভারতের বোম্বাই, আহমদাবাদ প্রভৃতি শহরে পুনরায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এতে ছয়শতাধিক লোক প্রাণ হারায় এবং ভারতীয় টাকায় সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হাজার কোটি রুপি বলে খবরে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ দাঙ্গায় বিশ সহস্রাধিক লোক হয়েছে উদ্বাস্তু। উল্লেখ্য যে, এ দেশেও নববর্ষে (১৯৯৩) 'মুর্তাদ' ও 'কাদিয়ানী' বিরোধী আন্দোলনের কোন ভাঁটা দেখা যাচ্ছে না। এসব দেখে শুনে ১৯৯৩ সাল কেমন যাবে বুঝা যাচ্ছে না। আমরা দরদে দীলে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছি যেন এ সালটি সবার জন্য শুভ হয়।

## ভাববার কথা

কোন দল, সংগঠন বা সম্প্রদায় যখন নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আদর্শের নামে ঘৃণা, হিংসা বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয় তখন দেখা যায় ঃ-

(১) কোন কোন দেশের ধর্মান্ধদের আচরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহং শিরকের স্থান দখল করে বসে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশের উর্ধ্বে নিজেদের খেয়াল খুশী ও কূট-কৌশলকেই প্রাধান্য দেয় এবং সেই ভিত্তিতেই সংখ্যালঘুদের সাথে ব্যবহার করে থাকে। তারা সংখ্যালঘুদের

উপাসনালয়, ঘরবাড়ী ধ্বংস করতেও দ্বিধা বোধ করে না। তাদেরকে গৃহ ছাড়া এমনকি হত্যাও করে থাকে। তাদের সর্বস্ব লুটে নেয়, ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দেয়।

(২) কোন দেশের এইরূপ সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতন করে যতই বাহাদুরী বোধ করুক না কেন, অন্য দেশে তাদের সহঅনুসারী সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের পথকেই প্রশস্ত করে। এ উপহাদেশে এর প্রচুর বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে।

(৩) ভিন্ন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের অপরাধের জন্য নিজের দেশে নিরপরাধ সংখ্যালঘুদের প্রতি জঘন্য নির্যাতন চালানো কখনো মানবতাবোধের পরিচয় বহন করে না।

(৪) ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি সীমানা ছাড়িয়ে গেলে কোন দেশ বা সমাজের ধ্বংস ছাড়া কখনো কোন গঠনমূলক কাজে লাগে না। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই এসবের মাঝে ধ্বংসকারী উপাদানেরই প্রাধান্য রয়েছে। অথচ প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, মানবতা, ঐক্য ও শান্তি-শৃংখলাবোধ ইত্যাদির মাঝেই গঠনমূলক উপাদানের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং সমাজ ও দেশ গড়ায় অগ্রসর হতে হলে এসব উপাদানকেই সজাগ ও সক্রিয় রাখতে হবে।

(৫) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্ষয়ক্ষতিকে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর দৃষ্টিতে দেখলে কখনও দেখার পূর্ণতা লাভ হবে না। যে দেশে তারা বসবাস করে সেই দেশের ক্ষয়ক্ষতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে অর্থাৎ তাদের (সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর) ক্ষয়ক্ষতি দেশ-বিচ্ছিন্ন ক্ষয়ক্ষতি নয়।

## আমাদের কথা ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন পাকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে সে সম্পর্কে আমরা নানাভাবে জবাব দিয়ে আসছি। আমরা বলছি যে, এ বিষয়ে যে কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, তাহলো কুরআন পাকের আরবী আয়াতসমূহ, ওসবের তরজমা এবং তফসীর যখন একত্রে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয় তখন তা বাজেয়াপ্ত করলে সাথে সাথে কুরআন পাককেও বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল্লাহ্‌র বাণীকে বাজেয়াপ্ত করার দায়িত্ব কোন সরকারের, বিশেষ করে মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সরকারের নেয়া উচিত কিনা এবং তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হবে কি না তাও গভীরভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। উল্লেখ্য যে, কুরআন পাকের তফসীর বিভিন্ন জন করেছেন, করবেনও। তফসীরকারীদের মধ্যে মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকও আছেন। বিভিন্ন ভাষাতে যেমন তফসীর হচ্ছে তেমনি একটি ভাষায় বিভিন্ন তফসীরও হচ্ছে। এসবের মাঝে প্রচুর ব্যবধান তথা মত পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা আবুল আলা মওদূদী ও মৌলানা আশরাফ আলী থানবীর তর্জমা ও তফসীর হুবহু এক নয়।

মতপার্থক্য সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে মতপার্থক্য রহমতস্বরূপ।" বস্তুতঃ মতপার্থক্য মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় ও উহাকে সমৃদ্ধ করে। তবে ইহা উম্মাহ্‌র মাঝে বিভক্তির কারণে পরিণত করে অকল্যাণে পরিণত না করার জন্য সদা সাবধান থাকা প্রয়োজন। এ হাদীস থাকার দরুন কোন তফসীর বাজেয়াপ্ত করার আন্দোলন না করে নায়েবে রসূল উলামায়ে কেরামের কাছে অনুরোধ, তারা যেন সম্মিলিতভাবে এহেন কোন

তফসীর প্রকাশ করেন যাতে সব মতপার্থক্যই শুধু দূর হবে না; ভবিষ্যতে নতুন আর কোন তফসীরেরই প্রয়োজন হবে না। যদি এহেন অসম্ভব সম্ভব না হয় তবে তফসীর বাজেয়াপ্ত করার আন্দোলনে সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করা সমুচিত কি-না তা নিরপেক্ষ মনে বিবেচনা করে দেখা দরকার। ২৯শে অক্টোবর (১৯৯২) ৪নং বকসী বাজারস্থ আহমদীয়া কমপ্লেক্স পোড়াতে গিয়ে কুরআনকে পোড়ানো হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থাগারে রক্ষিত অন্যান্য ধর্মের (বেদ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক ইত্যাদি) গ্রন্থাদিও ঐ আগুনে জ্বলেছে। এমন কি বাংলা ভাষায় প্রণীত অন্যান্য ওলামাদের কতিপয় তফসীরও পুড়ে গেছে। যেমন, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা মওদূদী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইত্যাদি (আল্লাহ্‌তা'লা এর দায়-দায়িত্ব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন ) পরিতাপের বিষয় যে, মৌলবাদী কোন কোন অংশ কাদিয়ানীদের কুরআন পোড়ানো হয়েছে বলে বিষয়টির গুরুত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করেছে। ধর্মান্ধ বলেই হয়তো তারা দেখতে পায়নি যে, সাথে সাথে ঐ কুরআনে আরবীতে লিখিত আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীকেও তারা পুড়িয়েছে। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করেছে বিধর্মীরা আর ঢাকায় মসজিদে আগুন দিল মুসলমান নামধারী তথাকথিত "তৌহিদী জনতা"। অবশ্য তাদের শ্লোগান ছিল 'আল্লাহু আকবার', 'ইসলাম জিন্দাবাদ'। যারা ধর্মীয় গ্রন্থাদি বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী— কুরআন পুড়িয়ে উল্লসিত হয়েছে সূরা বাকারার ১১৫ নং আয়াতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ই তাদের বিচার করবেন। আল্লাহ্‌তা'লা সূরা আলে-ইমরানের ১১১ আয়াতে মুসলমানদেরকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' বলে অভিহিত করেছেন। সেই উম্মতের দাবীদারেরা কুরআন পুড়াচ্ছে দেখে আমাদের হৃদয় গুমরে গুমরে কাঁদছে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আকুল আকুতি জানাচ্ছি, তুমি তাদের সুমতি দাও।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে সরকার কর্তৃক অমুসলিম ঘোষণা করার অযৌক্তিক ও অইসলামিক দাবী সম্পর্কে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য হলোঃ

* কোন দেশের সরকার নাগরিকদের ধর্ম নিরূপণ ও নির্ধারণ করার অধিকার রাখে কি?
* কোন সরকার যদি মুসলমনদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে তবে সে নিশ্চিতভাবে অমুসলমানদের মুসলমান ঘোষণা দেয়ারও অধিকার রাখে। যদি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দেশের হিন্দুদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয় তবে তারা সত্যি সত্যি কি মুসলমান হয়ে যাবে? এই সরকারী সিদ্ধান্ত কি ধর্ম জগতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্‌ পাকের কাছে গৃহীত হবে?
* উপরোক্ত নীতিতে ভারতীয় জাতীয় সংসদ যদি ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা কি সত্যি সত্যিই হিন্দু হয়ে যাবে?
* মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন ফিরকা বা সম্প্রদায়কে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম বানানোর অর্থই হলো উক্ত ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মুসলমান তা-না হলে এমন ঘোষণার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আমাদের প্রশ্ন, বিশ্বাস পরিবর্তন না করেও কেবল একটি 'সরকারী ঘোষণা' কি কারও ধর্ম পরিবর্তন করে দিতে পারে? কুরআন হাদীসে বা অন্য কোন ঐশী কিতাবাদিতে এমন কোন নির্দেশ বা নজির আছে কি?
* মুসলমানদের মধ্যে আহমদীয়া ফির্‌কা ছাড়াও ৭২টি ফিরকা আছে। যদি ধর্ম নিরূপণ করা সরকারী ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ফিরকাগুলির মধ্যে কোন্‌টি খাঁটি

ইসলামী ফিরকা এবং কোন্‌গুলো ভেজাল তা কোন সরকারের পক্ষে নির্ধারণ করা কখনও সম্ভব কি?

মৌলবী মৌলানা সাহেবদের মধ্য থেকে যারা 'আহমদীয়া' ফিরকাকে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী তুলেছেন তারা নিজেদের 'মুসলমানিত্বের' সার্টিফিকেট কোন সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে লাভ করেছেন কি? আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেককে যে কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ধর্ম বিষয়ে বিচার করার অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। কোন ব্যক্তি বা সরকার এ অধিকার নিজ হাতে তুলে নিলে খোদার উপর খোদকারী নয় কি? কোন ব্যক্তি বা সরকার নিজ ঘোষণায় যেমন মুসলমান বানাতে পারে না তেমনি অমুসলমানও বানাতে পারে না।

আমাদের কথা হলো ঃ– কোন সরকার, আদালত বা সংসদ কাউকে ঘোষণার মাধ্যমে যেমন মুসলমান বানাতে পারে না তেমন উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে অমুসলমানও বানাতে পারে না।

## গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ১৪০০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই দীর্ঘ সময় অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোকই ইসলামে ঈমান আনেনি। বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যা ৫৫০কোটি অতিক্রম করে চলেছে। ইদানিং মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০ কোটি বলে দাবী করা হচ্ছে। দু'তিন বছর আগেও মুসলমানদের সংখ্যা ১০০–১২৫ কোটি বলা হতো। এ সব সংখ্যা সঠিক কি–না সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, এখনও ৪০০ কোটির অধিক আদম সন্তান ইসলাম হতে দূরে সরে আছে। এতে স্পষ্টই দেখা যায় ইসলাম প্রচারের কত বিরাট ক্ষেত্র আমাদের জন্য খালি পড়ে আছে। পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানরা বিরাট সংখ্যাভুক্ত অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য বিশেষ কোন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না। বরং তারা নিজেদের মধ্যে বহু ফিরকার সৃষ্টি করে পরস্পর পরস্পরকে ফতোয়ার দ্বারা অমুসলমান ঘোষণা করছে এবং গত কয়েক বছর যাবৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে অমুসলমান ঘোষণার জন্য জোর আন্দোলনে নিজেদের সময় ও সামর্থ্যের বিপুল অপচয় ঘটাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন এরূপ করেছেন বলে কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হলে যোগ্যতা, একক নেতৃত্ব ও সংগঠনের সমন্বয় অত্যাবশ্যক। এসব দিককে অবহেলা করে বিশ্বময় ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হতে পারে না। উল্লেখ্য যে, একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই খেলাফতের অধীনে নিষ্ঠার সাথে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পরস্পর দলাদলিতে মত্ত হয়ে এবং সরকার কর্তৃক কোন মুসলমান সম্প্রদায়কে অমুসলমান করলে যে অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো পাকিস্তান। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঐ দেশে হাজার হাজার মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। কারণ হলো কোন আহমদী কাকেও সালাম বলেছে, কেউ কলেমা পড়েছে, কেউ

বিসমিল্লাহ্, ইনশাআল্লাহ্ উচ্চারণ করেছে এবং কেউ কুরআন তেলওয়াত করেছে ইত্যাদি। এ সবের দরুন নাকি অনেক 'ধর্মপ্রাণ মুসলমানের' প্রাণে আঘাত লেগেছে। সেই জন্যই তারা কোর্টে বিচারপ্রার্থী হয়েছে। ভেবে দেখুন মোকদ্দমা দায়েরকারীরা–আসামীগণ এবং শত শত উকিল–বিচারক এতে জড়িত হয়ে পড়েছে। মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও সময়ের কি বিরাট অপচয়! দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কি অপূর্ব কূট–কৌশল! এ সব দ্বারা কখনো কোন দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে কি? ঐ দেশের সুপ্রীম কোর্ট এ ধরনের মামলা মোকদ্দমার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। দেশ ও সমাজের কল্যাণকামী কেউ বাংলাদেশে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হউক তা চাইতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম নির্ধারণের দাবী সরকার মেনে নিলে বাস্তবে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ফলে ঐক্য ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ, অনৈক্য ও অকল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়।

চরম ভুক্তভোগী হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ হতে অনুধাবনের জন্য আপনাদের দরবারে এই বক্তব্য রাখছি যে, বাংলাদেশের আনুমানিক এক লাখ 'কাদিয়ানীর' সব জ্বালিয়ে দেয়া বা হত্যা করতে যাওয়ার মাঝে ১০/১১ কোটি মুসলমানের নেতৃত্বের দাবীদারদের তেমন কোন বীরত্ব বা বাহাদূরী আছে কি? আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখি যে, কোরআন শরীফ ও সুন্নাহ্র কষ্টি পাথরে আমরা মুসলমান। যারা আমাদেরকে বিপথগামী (?) মনে করেন তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো মহব্বতের সাথে আমাদেরকে বুঝানো। রসূল করীম (সাঃ) তো ইসলাম বুঝাতে গিয়ে রক্ত পর্যন্ত দিয়েছিলেন। আমাদের কাছে প্রচার করলে তো সে সম্ভাবনা নেই। কেননা আমরা তো শান্তিপ্রিয় মুসলমান। তবু না আসার কারণ বুঝি না। দ্বিতীয় কথা হলো, যারা আমাদেরকে অমুসলিম তথা 'কাফের' বা 'সংখ্যালঘু' মনে করেন, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শমতে তাদের মহান দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘুদের হেফাযত তথা পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এক মুখে তারা বলছেন কাদিয়ানীরা 'মুরতাদ' নয়। তারা কতলযোগ্য নয়। অপরদিকে তারা জনসভায় জোর গলায় ঘোষণা দিচ্ছেন সরকার তাদের দাবী না মানলে একটি একটি করে কাদিয়ানীকে হত্যা করা হবে।

সাময়িক উত্তেজনায় বা স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে দূরদৃষ্টি দিয়ে বিষয়টিকে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। ধর্ম যেমন অন্তরের ব্যাপার তেমনি আন্তর্জাতিক ব্যাপারও। ধর্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো সঠিকভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। এর ব্যতিক্রম হলেই অধর্মের দরজা খুলে দেয়া হয়।

যারা, আমাদের মসজিদকে 'উপাসনালয়' বলে হীন আক্রমণের গুরুত্ব হ্রাস করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, অন্যের উপাসনালয় ধ্বংস করার অধিকার ইসলাম তার অনুসারীদের দিয়েছে কি? যদি তা না দিয়ে থাকে (ইসলাম অবশ্যই তা দেয়নি) তবে এরূপ অপকর্ম দ্বারা ইসলামের অনুসরণ না বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে এ আত্মজিজ্ঞাসা আর কতদিন এড়িয়ে যাবেন?

## পরীক্ষা ও বিজয়

আল্লাহ্তা'লার পক্ষ থেকে যখনই যিনি প্রেরিত হয়েছেন তিনিই তাঁর বিরোধিতার কথা যেমন বলেছেন তেমনি তাঁর বিজয়ের সুসংবাদও দিয়েছেন। এই জামানায় ইসলামকে পুনর্জীবিত

ও পুনর্বাসিত করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণের ফলেই এই অনন্য মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁর মারফতও আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়েছেন যে, মোমেনদের পরীক্ষা হবে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিজয়ী হবে। নানাভাবে মোমেনদের পরীক্ষা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে প্রেরিত পুরুষ ও তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন অন্যতম প্রধান। আহমদী জামা'তের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এই পরীক্ষার মাধ্যমে মোমেনদের নিষ্ঠা, ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন সুস্পষ্ট ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি বিরুদ্ধবাদীদের অবক্ষয়ের রূপটিও ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়। উভয় দ্বারাই পরবর্তীরা উপকৃত হতে পারে। এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে বিবেচ্য যে, নবী রসূলগণ তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শের বিরোধিতার সাথে নিজেদের বিজয়কে এবং সত্যতাকে সংযুক্ত করে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। সমসাময়িক উলামা ও তাদের অনুগামীরা যদি নীরব থাকেন অর্থাৎ বিরোধিতা না করেন তবে সহজেই নবী-রসূলগণের দাবী যে মিথ্যা তা প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু কখনও তা হয়নি। এখনও তা হচ্ছে না। আমরা এখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর লিখা হতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিশ্চিত বিজয় সম্বন্ধে উদ্ধৃতি (বাংলা তর্জমা) দিচ্ছি ঃ- "হে লোক সকল! তোমরা শুনে রেখ, ইহা ঐ খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। এ জামা'তকে তিনি পৃথিবীর সর্ব দেশে সম্প্রসারিত করবেন এবং মহব্বত ও যুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের উপরে এ জামা'তকে গালবা (বিজয়) প্রদান করবেন। সে দিন অতি সন্নিকটে, বরং দ্বারদেশে উপস্থিত যে দিন সারা দুনিয়াতে কেবল একটিই মাজহাব তথা আহমদীয়া মুসলিম মাজহাব হবে, যাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লা এ সিলাসিলার উপর অসাধারণ ও অলৌকিকভাবে আশীষ বর্ষণ করবেন এবং যারাই এ সিলসিলাকে ধ্বংস করার প্রয়াসী হবে অবশ্যই তারা ব্যর্থ হবে। সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার গালবা হবে, 'চিরস্থায়ী গালবা' (চূড়ান্ত বিজয়)। (রূহানী খাযায়েন থেকে)

## বাংলাদেশ সম্পর্কে ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ১৯৯০ সালের মাঝামাঝিতে এক পত্রে বলেছিলেন যে, "আলাহ্ তাঁকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে যত পরিবর্তন হবে সবই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনকূলে যাবে।-------৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত খোতবায় তিনি বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলীর পটভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। "গুরুত্বপূর্ণ নসীহত" নামে এই খোৎবাটি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত খোৎবায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই তাৎপর্যবহ বক্তব্য রেখেছেন যা "একটি সতর্ক বাণী" (বাংলা তরজমা) নামে প্রকাশিত হয়েছে। সবাইকে এগুলো পড়ার ও প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এগুলোতে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক এবং নিজেদের সংশোধন করার নির্দেশনাও রয়েছে। সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা

খেলাফতের মাধ্যমে মোমেনদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় আমরা বাংলাদেশের আহমদীগণ বর্তমান খেলাফতের মাধ্যমে উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন স্বচক্ষে দেখেছি। আমরা এই জন্য আল্লাহ্‌র দরগাহে হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি।

আমাদের বিরোধিতার ব্যাপারে যে বিষয়টি অনুধাবন করার প্রয়োজন তা হলো- বিরুদ্ধাবাদীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের কথাকে না জেনে না বুঝেই বিরোধিতা করে থাকে। শুধু তাই নয় আমাদের বিরুদ্ধে অনেক জঘন্য মিথ্যাও প্রচার করে থাকে। এখানেই তারা ক্ষান্ত হয় না। তারা আমাদের উপর নানাভাবে ধাওয়াও করে থাকে। আমাদেরকে এই ধাওয়ার উত্তর দোয়া দিয়েই দিতে হবে। ধাওয়া ও দোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দোয়াই বিজয়ী হয়।

আমরা সবারই যে কল্যাণ চাই তা ধৈর্যের ও মহত্বতর সাথে তাদেরকে বুঝাতে হবে। তাদের বিরোধিতাও যে আমাদের উপকারে আসছে তাও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ১৯৯২ সালে তাদের বিরোধিতার দরুন পত্র-পত্রিকাদির মারফত দেশের আনাচে কানাচে আমাদের সম্পর্কে যে প্রচার হয়েছে তা হয়তো আমাদের গতানুগতিক পঁচিশ বছরের প্রচারেও সম্ভব হতো না। আজ পর্যন্ত রোজই কোন না কোন পত্রিকায় কোন না কোনভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উল্লেখ দেখা যায়। আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে, দেশে হিংস্র ও মৌলবাদমুক্ত সুস্থ ও মানবতায় পুষ্ট রাজনীতি প্রবর্তনের ধ্যান-ধারণা ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে। অনেকগুলো পত্র-পত্রিকাই এ ব্যাপারে বেশ সোচ্চার। আমাদের প্রচার কাজের জন্যও নতুন দিগন্ত খুলে গেছে আর তা কাজে লাগাতে হবে। শুধু ধর্মে বিশ্বাসীদের জন্য নয় যারা অবিশ্বাসী ও অর্ধবিশ্বাসী তাদের জন্যও আমাদের প্রচুর প্রচার সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমানগণকে মোমেন, মোনেমনকে আরও ভাল মোমেন করার নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বস্তুতঃ এর সফলতার মাঝেই আমাদের নিরাপত্তা অনেকখানি নির্ভর করে। অমুসলমান ভাই-বোনদের কাছেও ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে মহত্বতের সাথে হাজির হতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেন ঃ- "যদি কোন প্রতিবেশী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগে আর সে যদি নির্বাপিত করতে সচেষ্ট না হয় তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।

যদি আমার কোন শিষ্য দেখে যে, কোন খৃষ্টানকে কেউ হত্যা করতে চায় আর সে যদি তা প্রতিরোধ না করে তাহলে আমি স্পষ্ট বলছি যে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।" (সিরাজুম মুনীরঃ ২৮ পৃঃ)

"আমাদের ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় এ সব প্রাপ্তি কোন অংশেই কম নয়। এটি আমাদের দুঃখের মাঝেও বড় সান্ত্বনা। তবু যে বিষয়টি আমাদের মনে সর্বদা আঘাত হানে তাহলো মুসলমান কর্তৃক মসজিদে আগুন দেয়া ও কোরআন করীম পোড়ানো। এই সম্পর্কে জাগ্রত বিবেকের কাছে বিনীত আবেদন নামে যে ফোল্ডারটি আমরা প্রকাশ করেছি তা হতে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ কাঁদ বাংলাদেশ কাঁদ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিশ্বের ২য় স্থানের মহান গৌরবে অধিষ্ঠিত তুমি। তোমার বুকে ২৯শে অক্টোবর (১৯৯২) ঐ গরিষ্ঠতার অহংকারে স্ফীত ও ধর্মান্ধতায় মত্ত ইসলাম সেবক কিছু সংখ্যক লোক ৪নং বকশীবাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কমপ্লেক্সে ঢুকে কুরআন পাককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধর্মীয় ইতিহাসে এক কলংকময় অধ্যায় সংযোজন ঘটিয়েছে। এই কলংক মোচনের জন্য দেশের বিবেক জেগে উঠবে কি"?

২৯শে অক্টোবরে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে টাকার অংকে তা প্রায় দেড় কোটির মত। আমাদের মসজিদের ইমাম সহ ১৪ জন মুসল্লী গুরুতর রূপে আহত হয়েছেন। অনেক মূল্যবান ও দুর্লভ বই পুস্তক ছাই হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ও বিভিন্ন দেশে আমাদের ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত অনন্য প্রর্দনীটিকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। এ সবের বিস্তারিত আলোচনায় ব্যস্ত না হয়ে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে দৃঢ় পদক্ষেপে সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে হবে। তাক্‌ওয়া ও দোয়া দ্বারা বিপদকে নিয়ামতে পরিণত করতে হবে।

আল্লাহ্ চাহেন তো বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচার আরো জোরদার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এই জামা'ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বহুগুণে বেড়েছে। এই সুযোগকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রিয় খলীফা নানাভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমাদের সহানুভূতি জানানো ও উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাঁর প্রতিনিধিগণও পাঠিয়েছেন–এই জন্য আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণ চাই। তাই কল্যাণের দ্বারকে প্রশস্ত করার জন্যে দেশকে অবক্ষয়মুক্ত করার নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। এই জন্য চাই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে কল্যাণময় পরিবর্তন সাধন। আমরা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমেই তা করতে চাই। আল্লাহ্ আমাদের সবারই সহায় ইউন। আমীন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

২৮ মাঘ, ১৩৯৯
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

# জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন

আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হাইউন কাইউম অর্থাৎ জীবন্ত ও চিরস্থায়ী খোদা। সর্বদা তিনি তাঁর জীবন্ত, জাগ্রত অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে আসছেন নানা ভাবে।

কুদরত সে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হক্ সবুত,
ইস বেনিশাঁ কি চেহরানুমাঁ এহিতো হ্যায়।

আল্লাহ্ তা'লা যুগে যুগে তাঁর প্রেরিত পুরুষদেরকে পাঠিয়েছেন বিশ্ব সংসারে পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধি হয়ে এ যাবৎ যত নবী রসূল এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন দরিদ্র, নির্যাতিত, সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ। খৃষ্টানরা সুলায়মানকে (আঃ) King Solomon বা রাজা সলোমন বলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজা ছিলেন না। তাঁর পিতা দাউদ (আঃ) ছিলেন মেষের রাখাল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে তাঁকে ধর্মরাজ্য অর্থাৎ খিলাফত প্রদান করেছিলেন। এই খিলাফতের অধিকারী হয়েছিলেন সুলায়মান (আঃ) পরবর্তী কালে। তিনি রাজার পুত্র রাজা নন। খলীফার পুত্র খলীফা, নবীর পুত্র নবী। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্য লাভ করেননি। তিনি আমানত রূপে শাসনভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যাক, বলছিলাম,—আল্লাহ্ তা'লা যুগে যুগে অসহায়, দুর্বল, সর্বহারাদের মধ্য থেকে তাঁর নবী নির্বাচন করে থাকেন। এর কারণ, কোন সবল, প্রতাপশালী ব্যক্তিকে নবী মনোনীত করলে এবং সেই নবী জয়যুক্ত হলে মানুষ ভাববে যে, এই বিজয় হয়েছে লৌকিক শক্তি বলে। বাহু বলে, অর্থ বলে। অপর দিকে নবী যিনি পেট ভরে খেতে পান না, সমাজে যাঁর কোন পদমর্যাদা নেই, ধন নেই, জন নেই, সহায় সম্বলহীন, তিনি যখন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিণামে জয়যুক্ত হন তখন মানুষ হাইউন কাইউম-চিরজীব, চিরস্থায়ী খোদাকে চাক্ষুষ দেখতে পায়। যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে দেখতে পায়—কায়ানাল্লাহা নাযালা মিনাস সামায়ে। অর্থাৎ-আল্লাহ্ যেন স্বয়ং আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। তখন অজ্ঞ মানুষ ঐ নবীকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভ্রমে পতিত হয়।

ঈসা (আঃ) ছিলেন পিতৃহীন, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এক ব্যক্তি। তাঁর ভাষায়,—'পাখীরও বাসা আছে, শৃগালেরও গর্ত আছে, কিন্তু মনুষ্য-পুত্রের মাথা রাখার কোন স্থান নেই।' কিন্তু আজ এই অসহায় দুর্বল ব্যক্তিটি পূজিত হচ্ছেন 'ঈশ্বর-পুত্র ঈশ্বর' রূপে। দাউদের (আঃ) ভাষায় বলা যায়—'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করেছে, তাই কোণের প্রধান প্রস্তর হয়ে উঠল।' যুগে যুগে—এই পরিত্যক্ত প্রস্তরগুলোই প্রধান প্রস্তরে পরিণত হয়। প্রত্যেক নবীর জীবন এর উজ্জল বা জ্বলন্ত নিদর্শন। সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, বিতারিত নবী আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের হাতের পোষকতায় শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে জগদ্বাসীর কাছে গৃহীত হন, বরিত হন মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে।

যারা ঐশী নির্দেশ ছাড়াই নবধর্মের গোড়াপত্তন করে তারা ধনবল জনবল থাকা সত্ত্বেও পরিণামে ব্যর্থ হয়। এর উজ্জল দৃষ্টান্ত শাহানশায়ে হিন্দুস্তাঁ জালালুদ্দীন আকবর। বাদশাহ আকবর ১৫৮১ সালে দীনে এলাহী নামে একটি 'উদার' ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফল কি হল তা ভাষ্যকারের কথায় শুনুন। "ধর্মের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মহামতি আকবর উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নূতন এক ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার এই চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কেননা ধর্ম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিপ্রসূত; লৌকিক যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা উহার সমন্বয় সাধনকে প্রকৃত ধর্ম সমন্বয় আখ্যা দেওয়া চলে না (উদ্বোধন ঃ আষাঢ় ১৩৭৯)।

আমরা দেখলাম কোন সম্রাটও যদি ধর্ম প্রবর্তন করেন তাহলে তিনিও ব্যর্থ হন, অকৃতকার্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অপর দিকে নবীদের বিরুদ্ধে সমসাময়িক শক্তিধর রাজারাও যদি দণ্ডায়মান হয় তাহলে পরিণামে নবীর জয় এবং রাজাদের পরাজয় হয়ে থাকে। গরীব কুম্ভকার পরিবারের সন্তান ইবাহীমের (আঃ) বিরুদ্ধে প্রতাপান্বিত সম্রাট নমরুদ দণ্ডায়মান হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফেরাউন আইন করে মুসার (আঃ) জন্মকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। হুকুম দিয়েছিল বনী ইসরাঈলের ঘরে যেন কোন পুত্র সন্তান জন্ম না নিতে পারে। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে যার দ্বারা ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস হবে (The Talmud Selection. 123, 124)। কিন্তু ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস শত চেষ্টা করেও 'ঐ ছেলের' জন্মকে ঠেকাতে পারল না। ছেলেটি নদীতে ভেসে ভেসে এসে উঠল রাজ বাড়ীতে। একদম রাণীর কোলে। ছেলের মাকে বেতন দিয়ে রাখা হল ধাত্রীরূপে। মা ছেলেকে ফিরে পেল, তৎসঙ্গে বেতন ভাতা, নিরাপদ আশ্রয়। একেই বলে—মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকেরীন। দুশমনরাও পরিকল্পনা করে আর আল্লাহ্ তা'লাও পরিকল্পনা করেন। দাস বংশে জন্ম নিয়ে মূসা (আঃ) বিজয়ী হলেন আর পিরামিড সভ্যতার ধারক বাহক মহাপ্রতাপশালী মেরনাপতা ফেরাউন ডুবে মরে। আজ তার দেহটি খায়রুল মাকেরীনের নিদর্শন হয়ে যাদুঘরে রক্ষিত আছে। একেই বলে জ্বলন্ত নিদর্শন।

মহানবী বিশ্বনবীকে (সাঃ) গ্রেফতার করে আনার জন্য সম্রাট খসরু পারভেজ তার গভর্নরকে নির্দেশ দিল। পরওয়ানা পেয়ে মহানবী (সাঃ) বল্লেন, 'অপেক্ষা কর, কাল সকালে জবাব দেব।' পর দিন সকালে বিশ্বনবী (সাঃ) বল্লেন, 'আমার জীবন্ত খোদা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি তোমাদের খোদাকে তার পুত্র দ্বারা নিহত করেছেন।' খায়রুল মাকেরীন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের কী জ্বলন্ত দেদীপ্যমান নিদর্শন!

আল্লাহ্ র নিয়মে কোন পরিবর্তন হয় না। ওলা তাজিদুলি সুন্নাতিনা তাহবিলা। এই ধারা আজো প্রবহমান।

কাদিয়ান নিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করলেন। সমগ্র জগৎ চীৎকার দিয়ে এই দাবীকে রুদ্ধ করতে চাইল। শুধু মোল্লা পুরোহিত আর পাদ্রী রব্বীরাই নয় রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারীরাও তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দিতে উঠে পড়ে লাগল। আল্লাহ্—হাইউন কাইউম তাঁকে অভয় দিয়ে জানালেন,—

ছব ও লোগ জো তেরি জিল্লত কি ফিকর মে লাগে হুয়ে হ্যায় আওর তেরে নাকাম রাহনে কি দরপে আওর তেরে নাবুদ করনে কে খেয়াল মে হ্যায়, ও খোদ নাকাম রহেগে আওর নাকামী আওর না মুরাদি মে মরে গে (তাযকিরা, ১৪১ পৃঃ) জোশখ্স তেরি তরফ তীর চালায়েগা ম্যায় উসি তীরসে উসকা কাম তামাম করোঙ্গা (ঐ, ৫৪৭ পৃঃ)। অর্থাৎ—যারা ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদ আহমদকে (আঃ) অপমান অপদস্ত করতে চাইবে তারা ব্যর্থ হবে এবং এই ব্যর্থতা নিয়েই মরবে। তাঁর প্রতি যে তীর চালান হবে সেই তীর দিয়েই ওর ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। ইন্নি মুহিনুম্ মান আরাদা ইহানাতাকা—যারা তোমাকে অপমান করবে আমি তাকে অপমান করব। এই প্রতিশ্রুতি বার বার পূর্ণ হয়েছে। আফগানীস্থানের আমীর হাবিবউল্লাহ সর্বপ্রথম দু'জন আহমদীকে শরীয়তের দোহাই দিয়ে পাথর মেরে হত্যা করে। এরপর হাবিবউল্লাহ আপন ভাতিজার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানালেন—'রিয়াসত কাবুল মে করিব পঁচাছি হাজার আদমী মরেগে (তাযকিরা, ৭০৫ পৃঃ) সেই মৃত্যুর ধারা আজো থামেনি। সমগ্র জগৎ এই জ্বলন্ত নিদর্শন অবলোকন করছে। তাঁর উপর অবতীর্ণ আর একটি ঐশী বাণী হল,—'আহ্, নাদির শাহ কাহাঁ গিয়া।' কে জানত, এই নাদির শাহের আগমন হবে? বাদশাহ আমান উল্লাহ হাবিবউল্লার বংশের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেশ থেকে পলায়ন করবে?

জব কাহে কেহ্ করুঙ্গা ইয়েহ্ ম্যায় জরুর
টালতি নেহী ও বাত খোদায়ী এহি তো হ্যায়।

আল্লাহ্ তালা যখন যা বলেন তা কখনও রদ হয় না। আর এটাই হল আল্লাহ্র অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। উস বেনিশাঁকি চেহরানুমাঁ এহিতো হ্যায়।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর মালিক আমীর মোহাম্মদ খান কালাবাগ মসীহ মাওউদের (আঃ) দু'টি বই 'এক গলতিকা ইজালা' এবং 'খৃস্টান সিরাজউদ্দীন ঈসায়ী কি চার সওয়ালোঁ কা জওয়াব' বাজেয়াপ্ত করে। ফলে নিজ পুত্রের হাতে এই ব্যক্তি নিহত হয়। পারশ্য রাজের গভর্নর এসেছিল পারভেজের হুকুমে নবী সম্রাটকে (সাঃ) গ্রেফতার করতে আর ১৪শ 'বছর পরে এই গভর্নর বাজেয়াপ্ত করেছিল জামানার মা'মুরের দু'টি গ্রন্থ। ফলে জীবন্ত খোদার তাজাল্লিতে এই দুই অপরাধীই নিহত হল নিজ নিজ পুত্রের হাতে।

বাদশা ফয়সল আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং সৌদী আরবে আহমদীদের উপর ফরমান জারি করে হজ্জ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। পরিণামে এই আমীর ফয়সল নিহত হয় আপন ভাতিজার হাতে। আমীর হাবিব উল্লাহ আর আমীর ফয়সল দুই জনই নিজ নিজ অপকর্মের জন্য নিজ নিজ ভাতিজার হাতে নিহত হয়। এ কী আশ্চর্য্য ঘটনা! এ কী সাদৃশ্য। কে আছ চক্ষুষ্মান! একবার দেখবে কি? ফাতাবেরু ইয়া উলিল আবসার?

মসীহে মাওউদকে (আঃ) আল্লাহ্ তা'লা জানিয়ে ছিলেন,—(উদ্ধৃতি) "আমাকে কাফের ঘোষণা-কারী এক বিশেষ ইলযামে ধরা পড়বে, ছাড়া পাওয়ার কোন পথ থাকবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সবাই স্মরণ রাখুক.....যা ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে (তাযকেরা, ৩৫৩ পৃঃ) আমি আমার বাহিনীসহ এমন সময় উপস্থিত হব যে কেউ ভাবতেও পারবে না যে, এমনি ঘটনা ঘটতে পারে। এটি

প্রাতঃকালে অথবা রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সংঘটিত হবে (ঐ ৫৪৫) (কে যেন বলছে) —'মৃত্যুদণ্ড চল্লিশ দিন পর মৃত্যুর নির্দেশ।.....জিজ্ঞেস করলাম, এই আদেশের বিরুদ্ধে কি আপীল হতে পারে? বলা হল হতে পারে এমন কি আপীলের পর আপীলও হতে পারে (ঐ ৫৩০) ৫২ বৎসরে পদার্পণ করেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে (ঐ ১৮০ পৃঃ)। এথেকে জানা যায়—(১) এক ব্যক্তি কাফের অর্থাৎ অমুসলিম ঘোষণা দেবে (২) ঐ ব্যক্তি এক বিশেষ ইলযামে ধরা পড়বে (৩) সে আর ছাড়া পাবে না (৪) তার মৃত্যুদণ্ড হবে (৫) আপীলের পর আপীল হবে (৬) চল্লিশ দিন পর দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে (৭) সে যখন ৫২ বছরে পদার্পণ করবে তখন তার ফাঁসি হবে (৮) শেষ রাতে তার দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে (৯) এমনভাবে এই ঘটনাটি ঘটবে যে, কেউ তা ভাবতেও পারবে না। অর্থাৎ বেনজীর ঘটনা ঘটবে। ভুট্টোর বেলায় এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। ভুট্টোর মেয়ের নাম বেনজীর। এই নামটি ছিল তার অতি প্রিয়। তার জীবনের বহু ঘটনাই বেনজীর হয়ে আছে। (১) আহমদী মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অমুসলিম ঘোষণা করা একটি বেনজির ঘটনা (২) দলীয় লোকের দ্বারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটায় নেতার মৃত্যুদণ্ড হওয়া (৩) ২৫ টাকার বিনিময়ে খৃষ্টান তারা মসীহকে দিয়ে বধ করান। (জল্লাদের নামের সঙ্গে মসীহ শব্দটি যুক্ত রয়েছে) (৪) শেষ রাতে ফাঁসি হওয়া (৫) জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান এবং বিশিষ্ট নেতাদের সকল সুপারিশ বাতিল করে দিয়ে নিজের নির্বাচিত মনোনিত ব্যক্তির দ্বারা শাস্তি পাওয়া (৬) জেনারেল জিয়া কর্তৃক বেজন্মা বা ওলাদুল হারাম খেতাব পাওয়া (৭) মৃত্যুর পূর্বে পুঁজ ভক্ষণ করা ইত্যাদি ইল্লা হামিমাওঁ ওয়া গাচ্ছাকা (নাবা-২৬ আঃ) সেবা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকশিত বই 'অবিচার' এ পুঁজ খাওয়ার বর্ণনা আছে। উল্লেখ্য যে, পাপীকে পুঁজ খাওয়ানো হবে বলে সূরা নাবায় বর্ণিত হয়েছে। কী বেনজীর ঘটনা! কী অপূর্ব নিদর্শন!

খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের প্রধান শামসুদ্দীন কাসেমী লিখেছেন যে, ফয়সলের হস্তক্ষেপের ফলে ভুট্টো কাদিয়ানীদেরকে সেদেশে সংখ্যালঘু অমুসলমান ঘোষণা দিতে বাধ্য হন (কাদিয়ানী ধর্মমত, ১৪১ পৃঃ) কাসেমী সাহেবের কথাটি সত্য, তবে তার চেয়েও বেশী সত্য ফয়সল এবং ভুট্টোর অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ। কেউই আল্লাহ্‌র গযব থেকে রক্ষা পায়নি। কাসেমী সাহেবরা এই সত্যটি বুঝতে পারেননি। তিনি তার বইয়ে লিখেছেন, হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে তার এ ব্যাপারে আলাপ হয়েছে। তিনি এরশাদকে কাদীয়ানীদের সম্বন্ধে 'অধিক সজাগ' দেখতে পেয়েছেন (১৪৫ পৃঃ) হ্যা, কাদিয়ানীদের ব্যাপারে অধিক সজাগ থাকার কারণেই তিনি আজ কয়েদ খানায় অধিক সময় ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন।

কাদের কি কারোবার নমুদার হোগ্যায়ে
কাফের জো কাহতে থে ওহ গেরেফতার হো গায়ে।

এরশাদ সরকারের এক ধর্মমন্ত্রী ইরাকে ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৯ সালে আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার অঙ্গীকার করে দস্তখত দিয়ে আসেন (দৈনিক খবর, ২৯/১১/৯১)। দেশে ফেরার পর পরই এই মন্ত্রী তার ধর্মমন্ত্রীর পদ হারান। পদ হারিয়ে এখন তিনি আপদে আছেন।

অপর দিকে যে ইরাকে বসে তিনি এই দস্তখত করেছিলেন সেই ইরাক আজ জ্বলছে। জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন এর চেয়ে আর কি হতে পারে?

জেনারেল জিয়াউল হক যখন পাকিস্তানের ডিক্টেটর হয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তখন সেখানকার বহুল প্রচারিত জং পত্রিকা লিখেছিল, "পাকিস্তানে সর্ব প্রথম জনাব দৌলতানা কাদীয়ানী সমস্যাকে উঠিয়েছিলেন। যার ফল এই হল যে, এর পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার আসন থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেন। এর পর আইউব খান তার ক্ষমতার ডুবন্ত অবস্থায় এই সমস্যার সাহায্য নিতে চাইলেন। তিনি সংবাদ পত্র রেডিও ও টেলিভিশনে মির্যাইয়াতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা দিলেন। ঐ সময়কার পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর আমীর মোহাম্মদ খান মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রসিদ্ধ পুস্তককে বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হলেন না। অপমানিত হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে গেলেন। অতঃপর ভুট্টো..... তার ক্ষমতার ডুবন্ত বেলায় টিকে থাকার জন্য.....মির্যায়ী জামাতের ঘাড়ে আঘাত করলেন। .....ভুট্টোর ধারণা ছিল এই সমস্যা সমাধানের ফলে তিনি পাকিস্তানী জনতার হৃদয় জয় করে ফেলেছেন।...কিন্তু তার এই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। এখন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক সাহেব... মির্যায়ীদেরকে প্রধান প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু অতীতকে সম্মুখে রেখে অন্তর কেঁপে উঠে। কেননা অতীতে এ বিষয় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, যে ব্যক্তিই কাদিয়ানী সমস্যাকে উঠিয়েছে সে ক্ষমতা থেকে হাত ধৌত করেছে (লাহোর সংস্করণ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩)। আজ থেকে দশ বছর পূর্বের এই মূল্যায়ন যে কত সত্য ছিল তা জিয়াউল হক জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। বলা হয়েছে যে, যখনই যে ব্যক্তি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বলেছে, 'আমি কাদিয়ানী নহি' তাকেই ক্ষমতা থেকে হাত ধৌত করতে হয়েছে। জনৈক ব্যারিষ্টার এরশাদ সরকারের মন্ত্রী হলেন। লোকেরা বলল, এই ব্যক্তি কাদিয়ানী। বারিষ্টার সাহেব মন্ত্রীত্ব যাবার ভয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিলেন, 'আমি কাদিয়ানী নহি'। ব্যাস, এই 'কাদিয়ানী নহি' শব্দটি অল্পকালের মধ্যেই 'মন্ত্রী নহি' শব্দে পরিণত হয়ে গেল। সাবধান, আহমদীর সন্তানেরা! দুনিয়ার জন্য কখনও 'কাদিয়ানী নহি' বলবে না। যদি বল, তাহলে দীনও যাবে, দুনিয়াও যাবে।

মসীহে মাওউদ (আঃ) এক রুইয়াতে দেখলেন,—(উদ্ধৃতি), 'আমি যেন মিশরের নীলনদের তীরে দাঁড়িয়ে আছি।...আর আমি নিজেকে মূসা মনে করছি। পিছনে দেখলাম, ফেরাউন একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে আমাদেরকে ধাওয়া করছে।..... আমার সঙ্গী বনী ইসরাঈল অত্যন্ত ভীত, অনেকেই সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এবং উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলছে, হে মূসা, আমরা ধরা পড়ে গেলাম। তখন আমি উচ্চ কণ্ঠে বললাম, কাল্লা ইন্না-মায়ীয়া রাব্বি সা ইয়াহদীন—অর্থাৎ—না, না, এমন হতে পারে না, আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন, তিনি অবশ্যই আমার জন্য পথ খুলে দেবেন, (তাযকিরা, ৪৫৪ পৃঃ)। এথেকে জানা যায়, ফেরাউন সদৃশ এক ব্যক্তি আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে। (১) ফেরাউনের শক্তির উৎস ছিল সামরিক শক্তি (তফসীরে বায়জাবী, সূরা ফজর) (২) ফেরাউন কাফের আখ্যা দেয় (শূয়ারা-১৬) (৩) বনী ইসরাঈল তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোপে পতিত হয় (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ ২/৯৯ পৃঃ) (৪) সে ধর্ম বিষয়ে নেতাদের পরামর্শ নিত (আরাফ ১২৬) (৫) বিশ্বাসীদেরকে জেল দেবার হুমকি দেয় (শূয়ারা,

২৭ আয়াত) (৬) ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে ভাল কাজ ও পদ থেকে বঞ্চিত করে (দায়রায়ে-মারেফ, ৪৭৪ পৃঃ) (৭) ঐ সময় মুসলমানরা মসজিদ বলতে পারত না 'বায়ত' বলতে হোত (ইউনুস, ৮৬) (৮) ফেরাউন 'জামাতে নামায পড়া বন্ধ করে দেয় (মৌদূদীকৃত তফহিমুল কোরআন ৫/১৪৫ পৃঃ) (৯) মুসার উপর হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল (১০) তখন মুসলমানেরা প্রার্থনা করতেন, ওয়া তাওয়াফ্ফানা মিনাল মুসলেমীন অর্থাৎ 'নট মুসলিম' নয় মুসলিম রূপে মৃত্যু দাও (আরাফ, ১২৫) (১১) ঐ অত্যাচারের রাজত্ব দশ বৎসর চালু ছিল (Century Ency. of Names, ২/২৭২০) (১২) ফেরাউন তার সকল সঙ্গীসহ মৃত্যুবরণ করে (ইউনুস, ৮৭) (১৩) যে পথে ও বাহনে মূসা দেশ ত্যাগ করেন সেই রূপ পথে ও বাহনে ফেরাউন মৃত্যু বরণ করে (১৪) মুহর্‌রম মাসের এক শুভ বুধবারে ফেরাউন মৃত্যুবরণ করে ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, ফেরাউন শব্দের অর্থ সূর্য দেবতার প্রদীপ (তর্জুমানুল কোরআন, মৌলানা আযাদ কৃত, ২/৪৬০ পৃঃ ও উর্দু বিশ্বকোষ)। জিয়াউল হক অর্থও সত্য সুষ্টার প্রদীপ। কোরআন শরীফে সূর্যকেও জিয়া বা প্রদীপ বলা হয়েছে—(সূরা ইউনুস)।

মসীহে মাওউদের (আঃ) প্রতিনিধি, যুগের মসীলে মূসা-এর যুগে সামরিক শাসক আহমদীদেরকে কাফের আখ্যা দিয়ে আহমদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি রুদ্ধ করতে চায়। মোল্লা-মৌলবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আইন করে আহমদীদেরকে জেল দেয়। আহমদীদেরকে ভাল ভাল চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে। 'মসজিদ' শব্দটি ব্যবহার না করতে আইন করে। ফলে আহমদীরা মসজিদ স্থলে 'বায়ত' বলতে বাধ্য হয় (আসলে বায়ত এবং মসজিদ একই। যেমন মসজিদুল হারামই বায়তুল হারাম বা বায়তুল্লাহ)। আহমদীদেরকে জামাতে নামায পড়তে বাঁধা দেয়। খলীফাতুল মসীহ রাবে'র বিরুদ্ধে আসলাম কোরেশীকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। পাকিস্তানের আহমদীদের দিবারাত্র প্রার্থনা—হে আল্লাহ্! এই 'নট মুসলিম' আইনকে বাতিল কর এবং আমাদেরকে 'নট মুসলিম' নয় মুসলিম রূপে মৃত্যু দাও। মসীলে ফেরাউন জেনারেল জিয়ার রাজত্ব কম বেশী দশ বৎসর কায়েম ছিল। মসীলে মূসা খলীফাতুল মসীহ আকাশ পথে দেশ ত্যাগ করেন। মসীলে ফেরাউনও আকাশ পথে ভবলীলা সাঙ্গ করে। জিয়াউল হক মোহর্‌রম মাসের এক শুভ বুধবারে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে।

খোদাকি পাক লোগোঁ কো খোদাসে নুসরত আতি হ্যায়
যব আতি হ্যায় তো ফের আলম কো এক আলম দেখাতি হ্যায়।
ও বনতি হ্যায় হাওয়া আওর হর খাসেরাহ্ কো উড়াতি হ্যায়।
ও হো জাতি হ্যায় আগ আওর হার মোখালেফ কো জ্বালাতি হ্যায়।
কাভি ওহ্ খাক হো কার দুশমনোঁ কি সরপে পড়তি হ্যায়,
কাভি হো কার ওহ্ পানি উনপে এক তুফান লাতি হ্যায়।

আল্লাহ্ তা'লা মসীলে ফেরাউনকে জ্বালিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। মাটি তাকে কবুল করল না।

দৈনিক সংবাদ লিখেছে, "জিয়াউল হক শেষ নবীর পরে নবুওয়ত দাবী করেন নি। কিন্তু তিনি পাকিস্তানে যা করেছেন তা ফেরাউনের কার্যাবলীই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? (৩১/১২/৮৪)। দেখুন, জিয়াউল হক যে এ যুগের ফেরাউন তা শুধু আমরা নই অন্যেরাও বলছে। খান আব্দুল ওয়ালী খান এক বিশাল জনসভায় বলেন, "……বর্তমান যুগের ফেরাউনদের জিয়াউল হকের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, (দৈনিক মিল্লাত, লণ্ডন, সাপ্তাহিক আল্ নসর ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)। এখানে খান ওয়ালী খান বলেছেন, "বর্তমান যুগের ফেরাউনদের জিয়াউল

হকের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।" কেউ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আফসোস! ইতিহাসের শিক্ষা হল, কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তবে ইতিহাস সবসময়ই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে থাকে।

আজো যদি কেউ ঐশী জামাতের উপর শাসন ক্ষমতা বলে শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে তার পরিণামও পূর্ববর্তী ফেরাউনদের মতই হবে। সম্প্রতি আহমদী জমাতের খলীফা তাঁর এক খুতবায় বলেছেন, "নিকট ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, যারাই আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছে। .....খোদাতা'লা স্বয়ং এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য এক শিক্ষণীয় উপদেশ, এক দৃষ্টান্তমূলক বাণী উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আহমদীদের সাথে এরূপ অন্যায় আচরণ কর তাহলে তোমাদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে (১৮/১২/৯২)। মসীহে মাওউদের (আঃ) একটি ইলহাম হল, আওরত কি চাল (তাযকিরা ৫৯৭, ৬০৫)। আল্লাহ্ তা'লা এই চাল থেকে রক্ষা করুন। বাংলাদেশে পাকিস্তানী স্টাইলে আহমদী মুসলিমদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য মোল্লা-মৌলবীরা চীৎকার করছেন। তারা লং মার্চ করে বাবরী মসজিদে যেতে না পেরে ঢাকায় এসে ঘোষণা দিয়েছেন, "কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন" (সংগ্রাম ১৩/১/৯৩)। লং মার্চ বড়ই কঠিন আর বড়ই বিপজ্জনক। তাই এই সর্ট মার্চ দিয়েই লং মার্চের স্বাদ মিটাতে হবে। ওরা বাবরী মসজিদ নির্মাণ করতে না পেরে যশোহরে একটা নূতন বাবরী মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছেন (সংগ্রাম ২৫/১/৯৩)।

মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ্। ওরাও এক পরিকল্পনা নিয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাও এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্র পরিকল্পনা হল—সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আমরাও এই জন্য এক বিশেষ লং মার্চের আয়োজন করেছি। আমাদের লং মার্চ অযোদ্ধা তক নয়। আমাদের লং মার্চ সমগ্র জগৎকে যুদ্ধমুক্ত করে 'অযোদ্ধা পৃথিবী' অর্থাৎ যুদ্ধমুক্ত পৃথিবীতে পরিণত করা। মহানবী বিশ্বনবীকে (সাঃ) আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদে পরিণত করা হল।" তাই আমরা শুধু বাবরী মসজিদই আবাদ করব না। বরং সমগ্র বিশ্বে তৈরী করব অগণিত মসজিদ। যে মাসে এখানে আমাদের মসজিদে আগুন দেওয়া হয় সেই মাসে আমেরিকা মহাদেশে সর্ববৃহৎ মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। উপগ্রহের মাধ্যমে পাঁচটি মহাদেশে এই দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। আমি লং মার্চ করে সেখানে গিয়ে ছিলাম। আমার এই লং মার্চ—ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর—জার্মানী—কানাডা—নিউইয়র্ক—ওয়াশিংটন ক্যালিফর্নিয়া—মেকসিকো—জাপান—ভারত—ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমাদের এই লং মার্চ চলবেই চলবে। লং মার্চওলারা বলেছেন, 'মসজিদে মসজিদে কালো পতাকা উড়ান হবে। কারণ—কালো পতাকা হল ইমাম মাহদীর পতাকা (ইত্তেফাক, ১৩/১/৯৩)। আমরা মৌলবী সাহেবদের এই প্রোগ্রামকে স্বাগত জানাই। ইমাম মাহদীর (আঃ) যুগে ইমাম মাহদীর (আঃ) পতাকাই তো উড়বে। এর দ্বারা জানা গেল ইসলামের পতাকার রং হবে কালো। চাঁদ তারা, সবুজ আর কলেমা বা তরবারি খচিত পতাকা সত্যিকার ইসলামী পতাকা নয়। তাই কালো পতাকা যেখানে আমরা আছি সেখানে। সকল মুসলমানের উচিত এই কালো পতাকার তলে সমবেত হওয়া।

বাবরী মসজিদে উগ্র মুশরেক হিন্দুরা মূর্তি স্থাপন করে পূজো করছে। এক কালে কাবা শরীফেও মুশরেকরা মূর্তি স্থাপন করে পূজো করতো। এই মূর্তি সরিয়ে মসজিদে এক খোদার নাম নিতে হলে যুদ্ধ নয় আদর্শ দ্বারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যখন একজনও মুশরেক থাকবে না তখনই দূরীভূত হবে মূর্তি, আবাদ হবে খোদার ঘর—মসজিদ। আমরা মক্কা বিজয়ের পদ্ধতিতে বাবরী মসজিদ সহ দুনিয়ার সব মসজিদকে আবাদ করব, ইনশাল্লাহ। মুসলেহ মওউদের (রাঃ) ভাষায়-আবাদ করেঙ্গে হাম দুনিয়াকে ইয়েহ্ বিরানে।

ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

# বানী ইসরাঈল জাতির হারানো গোত্রসমূহ ও উহাদের সন্ধান লাভের প্রচেষ্টা

## ঈরানের প্রাচীন শিলা-লিপিসমূহ হইতে আবিষ্কৃত তথ্য আধুনিক যুগের পণ্ডিতগণের সমালোচনার উত্তর

[ মূল—মুহ্তারম শায়্খ আবদুল কাদের ]

অনুবাদ—মুহাম্মাদ মায্হারুল হক

বিশ্ব ইতিহাসে কতগুলি অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত তথ্য ও বিষয় ইতিহাস-গবেষকদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—বিশ্ব ইতিহাসের কোনও এক যুগে পৃথিবীতে এ্যাটলান্টিস নামক একটি দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বীপটি বর্তমানে অস্তিত্বহীন। উহা কোথায় কীরূপে সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তাহা একটি রহস্য বটে। অনুরূপ ভাবে বলা যায়—মিশরের পিরামিডগুলি কীরূপে নির্মিত হইয়াছিল, হযরত নূহ ( আঃ )-এর যুগের মহা প্লাবণ পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে সংঘটিত হইয়াছিল, হযরত নূহ ( আঃ )-এর নৌকার ধ্বংসাবশেষ কোন্ পর্বতের বক্ষে: বর্তমানে অবশিষ্ট রহিয়াছে, হযরত ঈসা ( আঃ ) ও তাঁহার মাতা মারয়াম ( আঃ )-এর পরিণতি কী হইয়াছিল, ক্রুশের ঘটনার পর তাঁহারা মাতা-পুত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন? এবং বানী ইসরাঈল জাতির হারানো গোত্রসমূহ—যাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করতঃ তাহাদিগকে একত্রিত করা হযরত ঈসা ( আঃ )-এর উপর অর্পিত অন্যতম দায়িত্ব ছিল—তাহারা কাহারা আর তাহারা বর্তমানে পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে বসবাস করিতেছে? —এই সকল বিষয় বিশ্ব-ইতিহাসের রহস্য হইয়া রহিয়াছে।

এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গবেষকগণ বানী ইসরাঈল জাতির হারানো দশটি গোত্রের সন্ধান লাভের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তাঁহাদের একদল, আফগান জাতিই যে সেই সকল হারানো গোত্র—এই বিষয়ে প্রায় ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা কাশমীর বাসীগণের মধ্যে বানী ইসরাঈল জাতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গ যেবের শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে আগত ফরাসী পর্য্যটক ডক্টর ব্রেঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আগত পর্য্যটক ইয়ং হাযব্যাণ্ড পর্য্যন্ত কয়েক ডজন পণ্ডিত গবেষক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বানী ইসরাঈল জাতির হারানো গোত্রগুলি আফগনিস্তানে ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। আফগান জাতি ও কাশ্মীরীদের চেহারা ও দৈহিক গঠন-প্রকৃতিতে বানী ইসরাঈলীয় লোকদের চেহারা ও দৈহিক গঠন-প্রকৃতি তথা তাহাদের রক্তের সংমিশ্রণের বৈশিষ্ট্যাবলী সুস্পষ্ট রূপে

সক্ষণীয়। ফিলিস্তীনের অন্তর্গত কেন্‌আন অঞ্চল—যাহা বানী ইস্‌রাঈলীয়দের প্রাচীন আবাস-ভূমি বটে—এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল—এতদুভয়ের বিভিন্ন স্থান ও শহরের নামের মধ্যে গভীর মিল ও সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যখন আফগান সরকার সরকারী ভাবে আফগান জনগোষ্ঠীর জাতীয়তার পরিচয় এই বলিয়া ঘোষণা করিল যে, আমরা বংশগত দিক দিয়া আর্য্য আর আমাদের প্রত্যেক বিষয়-ই আর্য্য-সুলভ, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রীতিমত ভড়কাইয়া গেলেন। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, তাঁহাদের পক্ষ হইতে বানী ইসরাঈল জাতির দশটি গোত্রের নিখোঁজ হইবার ঘটনাকে-ই অস্বীকার করা হইতে থাকিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কীরো "The Pathan" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি ইমাম রফীকের সহিত সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত গর্বের সহিত বলিয়াছেন যে আফগানদের বানী ইসরাঈল জাতির লোক হইবার দাবীকে আমি নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করি না।' তিনি উহাকে নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করিলে আফগানিস্তানের সরকারকে কী রূপে তুষ্ট করা যাইত? অধ্যাপক ফিলিপ কে হিট্টি বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে "তারীখ-ই-শাম" (History of Seria) নামক একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন:

'বানী ইসরাঈল জাতির দশটি গোত্রের নিখোঁজ হইয়া যাইবার বিখ্যাত কাহিনী প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে। যাহারা (ফিলিস্তীন হইতে) নির্বাসিত হইয়াছিল, তাহারাও পরবর্তী কালে স্বজাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছিল। বৃটেন ও আমেরিকার একদল গবেষক-পণ্ডিত তাহাদের সন্ধানে এবং তাহাদের বর্তমান বংশ-পরিচয় আবিষ্কারে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, উহা হাস্যকর ছিল (দেখুন: ডঃ ফিলিপ কে হিট্টি রচিত তারীখ-ই-শাম; উর্দু অনুবাদ—মাওলানা গোলাম রসূল মেহের, ১৫৭)।'

অনুরূপভাবে ডঃ শাউন ফিল্ডও দশটি গোত্রের নিখোঁজ হইয়া যাইবার ঘটনাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার The Essene odyssey (1984 A.D.) নামীয় গ্রন্থে বলেন—"বানী ইসরাঈল জাতির দশটি গোত্রের হারাইয়া যাইবার ধারনা সম্পূর্ণ রূপে ভ্রান্ত। অতএব, যিশুকে প্রাচ্য দেশে টানিয়া আনিবার কোনও প্রয়োজন নাই।"

উপরোক্ত গবেষক-পণ্ডিতগণের মতে বাইবেল, তালমূদ এবং য়াহূদী উলামা ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর এই দাবী ভ্রান্ত যে, বানী ইসরাঈল জাতির দশটি গোত্র ইতিহাসের অন্ধকার গলিতে হারাইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগকে একত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে হযরত দাউদ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক বংশধরগণের মধ্য হইতে একজন প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত হইবেন। উক্ত গবেষক-পণ্ডিতগণের মতে ফাকীহ্‌ ও ধর্মতত্ত্ববিদ আযরা রচিত বলিয়া কথিত 'আযূবাস' নামীয় গ্রন্থের দাবী সঠিক নহে। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থে প্রথমে প্রাচ্যের দূর দূরান্ত দেশসমূহে দশটি গোত্রের নির্বাসিত হইবার ঘটনা এবং পরে হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক তাহাদের অনুসন্ধান, সন্ধান লাভ ও প্রত্যাবাসনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

# তাহ্‌রীকে জাদীদ

( ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর )

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(ক) আর্থিক কুরবানীর ভিত্তি সাদাসিদে জীবন যাপনের ওপরে ঃ

মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন অপরিসীম। কিন্তু এর তুলনায় মানুষের আয় অনেক সীমিত। এ সীমিত আয় থেকে আবার আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা বড়ই কঠিন। তাই সাদাসিদে জীবন যাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান কালে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করার লোক খুব কমই পাওয়া যায়। সবাই দুনিয়ার আরাম আয়েশের পিছনে ছুটছেন। আল্লাহ্‌র প্রয়োজনের দিকটাকে খাটো করে দেখে নিজের প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখা হয়। কেবল মাত্র জামাতে আহমদীয়ার লোকেরাই এর ব্যতিক্রম। তারা শত অসুবিধে সত্বেও রীতিমত আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করতে অভ্যস্ত। আর এজন্যে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে তরবীয়ত দেয়া হয়েছে। সাদাসিদে জীবন যাপনের দিকটাকে বুঝাবার জন্যে তাহরীকে জাদীদের প্রবর্তক হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) জামাতকে অনেক নসিহত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো যাতে জামাতের নবাগত এবং নতুন প্রজন্ম এথেকে উপকৃত হতে পারেন :

"এই যামানার জন্যে আর্থিক কুরবানীর বিশেষ প্রয়োজন। এজন্যে সকল নারীপুরুষ নিজ নিজ জীবনকে অনাড়ম্বর করুক। নিজের খরচ কম করে দিক। কেননা যখনই খোদার তরফ থেকে কুরবানীর ডাক আসবে তখন যেন সে নিজেকে প্রস্তুত পায়। কুরবানীর জন্যে তোমার শুধু নিয়্যতই এককভাবে কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট রসদ না থাকে। একজন অন্ধ জেহাদের আকাঙ্খা পোষণ করলেও উহাতে সে শামেল হতে পারে না। এক গরীব যাকাত দিবার ইচ্ছা করলেও সে তা পারে না। তাই রসদ না থাকলে ইচ্ছা প্রবল থাকা সত্ত্বেও আমরা কুরবানী পেশ করতে পারি না। ইহার জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা দরকার যেন খোদাতা'লার নিকট থেকে ডাক আসার সাথে সাথে আমরা হাযির হতে পারি। যদি তার সুযোগ নাও আসে তবুও খোদার কাছে বলা যাবে যে, আমরা যা কিছু জমা করেছিলাম, ধর্মের খাতিরেই জমা করেছিলাম ; যদিও তার উত্তরাধিকারী আমাদের সন্তান সন্ততিগণ"। ( আল্‌ ফযল : ১২ইজুন, ১৯৩৫)

"তোমরা বৃহত্তর কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও, মেহনত এবং কঠোর পরিশ্রম করার শক্তি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হোক, মুশকিল এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে শেখ যদি তোমার নিকট সম্পদ আসে তবে তোমরা বৃহত্তর কুরবানী করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করবে, কেবল অন্তরের কুরবানীতে আর্থিক কুরবানীর ফল লাভ হবে না। অন্তর থেকে

কুরবানীর জন্যে প্রস্তুতির সাথে সাথে অর্থের সংকুলান থাকলে তবেই কুরবানী পেশ করা যাবে"। (বক্তৃতা সালানা জলসা : ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

"আমি জামা'তকে সাদাসিদে জীবন যাপন করার জন্যে বলেছি এবং সাদাসিদে জীবন যাপন করা ফরয নয় নফল—অর্থাৎ যার ইচ্ছে সে করবে যার ইচ্ছে না হয় সে না করবে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এটা ভিন্ন জামা'তের মধ্যে কুরবানী করার সঠিক প্রেরণা কোন ভাবেই সৃষ্টি হতে পারে না এবং রূহানিয়াতের উচ্চ মর্যাদাও লাভ করা যাবে না। যদি তোমরা মনে কর যে, ইহা ভিন্ন রূহানিয়্যতের উচ্চ সোপান লাভ করতে সক্ষম হবে, তবে ইহা নিজের আত্মাকে ধোকা দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কোন সন্দেহ নেই যে, ইহা কুরবানী কিন্তু বহু নফল কুরবানীও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন—রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন—'নফলের মাধ্যমেই খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করা যায়'। অবশ্যই বলি যে, ঐ লেখা, 'আলা শাফাহুফরাতেম্ মিনান্নার' অর্থাৎ যে অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় আছে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার খুবই আশংকা আছে'। (খুতবা জুমুয়া : ২৬শে মে, ১৯৩৯ইং)

'যাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে বাহুল্য পাওয়া যায় তারা জীবন বা সময়ের কোনও কুরবানীই করতে সক্ষম হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তন না হয় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে অনাড়ম্বরতা সৃষ্টি কর। একের অধিক তরকারী ব্যবহার কর না। প্রত্যেক আহ্‌মদী যে এই সংগ্রামে আমার সাথে যোগ দিতে চায়, তার প্রতিজ্ঞা করা দরকার যে, আজ থেকে সে একের অধিক তরকারী খাবে না"। (খুতবা জুমুয়া : ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৭ সন)

"নিঃসন্দেহে এক খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ। ইহার বেশী খাওয়ারও অনুমতি আছে। অবস্থা বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম করা যায়। যেমন রসূল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এক খাবারই তাঁর জন্যে যথেষ্ট ছিল। বিশেষ দাওয়াতে অথবা দুই ঈদের দিনে তিনি একাধিক খাদ্য গ্রহণ করতেন। তাই আমিও দুই ঈদকে এই বাধ্য-বাধ্যকতা থেকে রেহাই দিয়েছি। কেননা যখন রসূল করীম (সাঃ)-এর সামনে এই প্রশ্নই পেশ হয়েছিল তখন তিনি দুই ঈদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমান দের জন্যে খানা-পিনার দিন নির্ধারণ করেছেন। তাই আমি সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধে যে হেদায়াত দিয়েছিলাম এর মধ্যে এটাও নির্ধারিত করেছিলাম যে, দুই ঈদের দিনে একের অধিক খাদ্য খাওয়া যাবে। তবে লোকদের উচিত তাদের নিজস্ব বুদ্ধি খাটিয়ে লক্ষ্য রাখবে যেন এতেও অনাড়ম্বরতার সীমা না ছাড়িয়ে যায়। কেননা যখন নীতিগতভাবে সাদাসিদে জীবনকে গ্রহণ করা হয়েছে তখন এর কার্যকারিতার জন্যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।"

"পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা খুবই প্রয়োজনীয় দিক। আমি দেখেছি পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা না থাকায় আমীর এবং গরীবের মধ্যে গগনচুম্বী প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ধনী সব সময় তার কাপড় সামলিয়ে রাখে এবং সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন তার কাপড়ে

কোন দাগ না লাগে বা ময়লা না হয়। এইজন্যে সে সর্বদা গরীব থেকে তফাতে থাকে। কাপড় চোপড়ে আড়ম্বরহীনতার বিশেষ প্রয়োজন এবং আমি তো বলব যে, যদি কারও কাছে এক জোড়া কাপড় থাকে আর সে সর্বদা এইভাবে সন্ত্রস্ত থাকে যে ইহাতে ময়লা বা দাগ লাগল কি-না এবং এইভাবে গরীবের প্রতি তার মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হয় তবে ঐ লোক নিশ্চয় তাহরীকে জাদীদের এই দাবীর প্রতি আমল করে নি। এর তুলনায় আমি ঐ ব্যক্তিকে অধিকতর আড়ম্বরহীন বলব যার ২/৩ জোড়া কাপড় আছে এবং সে গুলো সম্বন্ধে এই রকম সাবধানতা অবলম্বন করে না, যাতে আমীর এবং গরীবের মধ্যে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ফল কথা এই যে, পোষাক পরিচ্ছদে এই রকম বাহ্যিকতা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। মানব জাতির মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর সৃষ্টি করে তা সুন্নতের আওতা বহির্ভূত এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী কাপড়ের পরিমাণ দিয়ে তা বিচার করা যায় না। এই হেদায়াত কোন সাময়িক নয় বরং স্থায়ী হেদায়াত। কেননা এর ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হতে পারে''।

(খুতবা জুমুআ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন)

''ভাল ভাল পোষাক মেয়েদের নিকট পসন্দনীয়। এই ব্যাপারে তারা বেশ অপচয়ও করে থাকে। ফল কথা এই যে, বহু সংসার শুধু ভাল পোষাক পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদির জন্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ইংরেজ অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী জাতি, কিন্তু তাদের মধ্যেও বহু ধনী লোক মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদে খরচের জন্যে ধ্বংস হয়ে গেছে।''

(খুতবা জুমুআ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন)

''বস্তুতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে অলংকার একটি অপকারী বস্তু। কেননা এর মধ্যে জাতীয় সম্পদ বিনা কাজে আটকে থাকে এবং ঐ সোনা রূপা জমা করার বাসনা প্রসঙ্গে কুরআন করীমে বলা হয়েছে যে, যারা সোনা রূপা একত্র করবে কেয়ামতের দিন ঐ সোনা রূপা গরম করে তাদের শরীরে দাগ দেয়া হবে।'' (খুতবা জুমুয়া : ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন)

''মেয়েরা অলংকার পসন্দ করে এবং মেয়েদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং কুরআন করীমের 'ইউনাশ্শাও ফিল হিলিয়া'' অর্থাৎ মেয়েরা অলংকারের মধ্যে প্রতিপালিত হয় বর্ণনা মোতাবেক মেয়েদেরকে যেভাবে সামান্য অলংকার ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পুরুষদেরকে সেভাবে রেশমের ব্যবহার নিষেধ করেছে। মেয়েদের সুযোগ দিয়েছেন যে, তারা কিছু অলংকার, কিছু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে শোভা বর্ধন করতে পারে''।

''আয়ের এক চতুর্থাংশ চিকিৎসার জন্যে ব্যয় হয়। তাই ডাক্তারগণ এই রকম প্রতিজ্ঞা করুন যে, সর্বদা চেষ্টা করবেন যেন অল্প পয়সার মধ্যে চিকিৎসা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মনে করেন যে, ঔষধ না দিলে রোগীর ক্ষতি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দামী ঔষধের ব্যবস্থা করবেন না।''

''বিয়ে-সাদী এবং খুশীর সময়ও খরচের মাত্রা কমানো যায়। নতুন পরিবেশের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। কেবল সদিচ্ছার প্রশ্ন। একেবারে না করেও পারা যায় না। তবে

লক্ষ্য রাখা উচিত যেন জোড়ায় জোড়ায় কাপড় এবং বেশী বেশী গহনার বাহাদুরী না হয়। খেয়াল রাখা দরকার যেন তিন বৎসরের মধ্যে ঐ জিনিস কম দিলেও চলে। যে ব্যক্তি আপনার কন্যাকে বেশী দিতে চায় সে যেন গহনা এবং নগদ টাকার মাধ্যমে কিছু দেয়"।

(খুতবা জুমুআ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন)

"দেন-মহরও মাত্রাতিরিক্ত ধার্য করা হয়ে থাকে। আমাদের ঘরে সাধারণতঃ এক হাজার টাকা 'মহর' ধার্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কম বেশীও হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আমি দেখেছি যে, সাধারণ লোকেও পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার "মহর" ধার্য করে থাকে। যদিও তাদের সম্পত্তি বা আয় খুবই কম। যাই হোক, সামর্থ্যানুযায়ী করা উচিত"। (খুতবা জুমুআ: ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন)

"ইসলাম ঐ সমস্ত লোক দেখানো কাজ যা ধোকা দেয়ার জন্যে করা হয়—নাজায়েয করেছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর আমল থেকে জানা যায় যে, তাঁরা বিবির সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই "মহর" আদায় করে দিতেন। যদি একবারে আদায় না করা যায় তবে সময় নিয়ে আদায় করা উচিত। 'মোআজ্জেল' (তরিৎ দেয়) এবং গয়ের 'মোআজ্জেল' পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার। ইসলামী শরীয়তের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যতদূর হয় প্রথমেই আদায় করা দরকার। পরে আস্তে আস্তে শোধ করা দরকার কেননা ইহা নারীর কাছে পুরুষের দেনা। ইহা আদায় করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।" (খুতবা নিকাহ: প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮-৪০)

"সপ্তম প্রশ্ন ঘর বাড়ীর সাজ-সজ্জার ব্যাপারে। সাধারণ অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ইহারও পরিবর্তন হয়ে থাকে। যদি খাদ্য এবং পোষাকের মধ্যে আড়ম্বরহীনতা সৃষ্টি হয় তবে স্বাভাবিকভাবে ইহার মধ্যেও আড়ম্বরহীনতা এসে যাবে। আমি সাধারণভাবে এই কথা নসিহত করতে চাই যে, সাজ সজ্জার জন্যে যেন অহেতুক টাকা পয়সা নষ্ট না করা হয়"। (খুতবা জুমুয়া: ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন)

## তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তন্মধ্যে একটি নিম্নরূপ:—

"তাহরীকে জাদীদ কোন নতুন ঘোষণা নয় বরং ইহা ঐ পুরাতন তাহরীক যা আজ থেকে সাড়ে তেরশ' বছর পূর্বে রসূল করীম (সাঃ)-এর মারফত জারী করা হয়েছিল। ইঞ্জিলের ভাষায় বলতে হয়—পুরাতন সুরা নতুন বোতলে পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু ইহা ঐ সুরা নহে যা নেশাগ্রস্থ করে এবং মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে লোপ করে দেয় বরং ইহা ঐ সুরা যে সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে—লা ফীহা গওলুন ওলাহুম আনহা ইউনযাফুন—অর্থাৎ উহাতে কোন মাদকতা থাকবে না বা উহার ব্যবহারে তারা মাতালও হবে না।

(৩৭ : ৪৮) কেননা উহার উৎস ঐ ঐশী জ্যোতিঃ যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ ধরায় নিয়ে এসেছেন।' (বক্তৃতা : ১৩-৭-৩৮)

## তাহরীকে জাদীদের সফলতা ঃ

তাহরীকে জাদীদের মহান সফলতা সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন—

"যদি তোমরা প্রত্যেকেই আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে খোদাতা'লা অদৃশ্য থেকে উপকরণ সৃষ্টি করে দেবেন। কিন্তু ইহা হতে পারে না যে, খোদাতা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে যা বলেছেন এবং যে নক্‌শা সম্বন্ধে তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন অথচ তা হবে না। উহা অবশ্য অবশ্যই হবে যদিও বা বন্ধু শত্রু সবাই আমাকে ছেড়ে যায়। খোদাতা'লা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং অট্টালিকা তৈরী করে তবে ছাড়বেন। (আল্ ফযল : ৭-১১-১৯৩৫) পুনরায় 'আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি কেবল দৃঢ় বিশ্বাসই নয় বরং এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যার সাথে দলিল প্রমাণ রয়েছে আর যার প্রত্যেকটি কড়া আমার মস্তিষ্কে রয়েছে। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমি বলছি যে, যদি আবেগপ্রবণ লোকদের ঐ পরিকল্পনা পসন্দ না হয় কিন্তু আমাদের জামাতের বন্ধুগণ সত্যিকারভাবে যদি এর ওপর কার্যক্রম চালায় তাহলে অবশ্য অবশ্যই বিজয় তাদেরই"। (খুতবা জুমুআ : ৪-৬-১৯৩৫)

## এ তাহরীক সম্বন্ধে অন্যদের প্রশংসা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর এ মহান তাহরীক তদানীন্তন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারাও হুযুর (রাঃ)-এর এ তাহরীকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে লাহোর থেকে প্রকাশিত "ইনকিলাব"-এর ৪-১২-৩৪ তারিখের একটি নোটের আংশিক উদ্ধৃতি প্রদান করছি :

"আহমদীদের ইমাম তাঁর অনুগামীদের আদেশ দিয়েছেন যে, আগামী ৩ বছরের জন্যে যেন তারা সিনেমা, থিয়েটার ও সার্কাস ইত্যাদি অবশ্যই না দেখে। খাওয়া পরায় যেন অত্যন্ত সাদাসিদে পন্থা অবলম্বন করে। বিনা প্রয়োজনে কাপড়-চোপড় তৈরী না করে। যতদূর সম্ভব পুরাতন কাপড় দিয়ে দিন চালায় এবং তবলীগের জন্যে চাঁদা দেয়। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যারা আজকাল কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার তাদের উচিত তারাও যেন এথেকে উপকৃত হয়।"

## তাহরীকে জাদীদের দপ্তরসমূহ ঃ

### (ক) তাহরীকে জাদীদের প্রথম দপ্তর ঃ

প্রথমে ৩ বছরের জন্যে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৩৭ সনের ২৬শে নভেম্বর তাহরীকে জাদীদের ২য় বছরের ঘোষণা করেন যা এপ্রিল ১৯৪৪ সন পর্যন্ত চলে এবং একে তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে আওয়াল

(প্রথম দপ্তর) নামে ঘোষণা দেয়া হয়। হুযুর (রাঃ) জামাতের নিকট তাহরীকে জাদীদের জন্যে প্রথম ২৭ হাজার টাকার একটি ফাণ্ডের প্রস্তাব দেন। জামাত সেখানে ৯৮ হাজার টাকার একটি ফাণ্ড পেশ করে দেয়। তাহরীকে জাদীদের প্রথম দপ্তরের মোজাহেদীনের সংখ্যা ছিল ৫,০০০।

## দ্বিতীয় দপ্তরের ঘোষণা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৪৫ সনের মে মাসে তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে দওম ('দ্বিতীয় দপ্তর)-এর ঘোষণা দেন আর এ দপ্তরের মোজাহেদগণের জন্যে ৫টি শর্ত আরোপ করেন। ১৯৪৫ সনের মে মাস থেকে যারা এ তাহরীকে অংশ গ্রহণ করেছেন (জন্মসূত্রেই হোক বা বয়াত সূত্রেই হোক) তারা এ দপ্তরের মোজাহেদ। শর্তগুলো নিম্নরূপ :—

১) চাঁদা যেন এক মাসের আয়ের সমান হয়।

২) তারা ১৯ বছর পর্যন্ত চাঁদা দিতে থাকুন এবং প্রত্যেক বছর এতে বাড়িয়ে দিন।

৩) আয় বন্ধ হয়ে গেলে বা চাকুরী থেকে অবসর নিলে সত্বর যেন তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানকে অবহিত করা হয়।

৪) এ দপ্তরের মোজাহেদ ছিলেন প্রায় ২০,০০০। প্রথম বছরের ওয়াদা ছিল ৫২,৭২৫/- ১৯৬৩ সনে যা ২,০৯,০০০/- টাকায় উন্নীত হয়।

## তৃতীয় দপ্তরের ঘোষণা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ) ২২শে এপ্রিল, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহরীকে জাদীদের সওম (তৃতীয় দপ্তর)-এর ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অসুস্থতার কারণে এ দপ্তরের ঘোষণা দিতে পারেন নি। তাই তিনি নির্দেশ দেন ১৯৬৫ সনের ১লা নভেম্বর থেকে এ দপ্তরের কাজ গণ্য করা হবে যাতে তৃতীয় দপ্তরকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর সময়ে গণ্য করা যায়। যেসব আহমদী এ সময়ে ও এর পরে এই মহান তাহরীকে অংশগ্রহণ করেছেন তারা এ দপ্তরের মোজাহেদ বলে গণ্য। হুযুর (রাহঃ) আশা করেছিলেন, তৃতীয় দপ্তরের মোজাহেদগণ তাদের চাঁদার ওয়াদা ৮ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের নেগরানীর দায়িত্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্কন্ধে ন্যস্ত করেন।

## চতুর্থ দপ্তরের ঘোষণা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৫ সনে ২৫শে অক্টোবরের জুমুআর খুৎবায় তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে চাহরাম (চতুর্থ দপ্তর)-এর ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আজ

থেকে যত নূতন মুজাহিদ তাহরীকে জাদীদে শামেল হবেন তারা তাহরীকে জাদীদের চতুর্থ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ১৯৮৫ সনের ১লা নভেম্বর থেকে এ দপ্তর কার্যকরী হয়। এ সময়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার পরিমাণ ছিল এক কোটি একুশ লাখ রূপীরও কিছু বেশী।

## প্রথম দপ্তরের মোজাহেদীনের কুরবানীকে জাগ্রত করুন ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৪ ২৬শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন : "প্রথম দপ্তরের মোজাহেদীনের এক বিশেষ মাকাম ও মর্যাদা রয়েছে। এ দলটির বেশীর ভাগই হযরত মসীহ মাওউদ (আইঃ)-এর সাহাবা এবং পরবর্তীকালের বুযুর্গানের সমন্বয় গঠিত। সুতরাং তাদের হক্ এই যে, তাঁদের কুরবানী যেন তাঁদের মরণোত্তর সময়েও জারী রাখা হয়। এসব মোজাহেদীনের সন্তানগণ যেন তাদের পিতৃ পুরুষের কুরবানীসমূহকে পুনর্জীবিত রাখেন যাতে কিয়ামতকাল ব্যাপী সেগুলোকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং নিজেদের ও পরবর্তী বংশধরগণের গৃহগুলোকে কল্যাণ ও আশিসে ভরপুর করে নিতে পারেন।"

হুযূর (আইঃ) আরও বলেন, "প্রথম দপ্তরে এমন কিছু ওফাতপ্রাপ্ত মুজাহিদও থাকতে পারেন যাদের কোন সন্তানাদি নেই। তাহরীকে জাদীদের দপ্তর আমাকে এইরূপ বন্ধুদের তালিকা সংগ্রহ করে দিন। তাঁদের কুরবানীকে জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে আমি তাদের পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করবো।" হুযূর (আইঃ)-এর উপরোক্ত ঘোষণা দ্বারা প্রথম দপ্তরের মোজাহেদীনের সন্তান-সন্ততি এবং জামাতের দায়িত্ব কতখানি বেড়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

## ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহ্রীককে স্থায়ী করা হল ঃ

তাহরীকে জাদীদের ঘোষণাকালীন সময়ে ৩ বছরের জন্যে তাহরীকে ওয়াকফে জিন্দেগী জারী করা হয়েছিল। কিন্তু চাহিদা ব্যাপকতর হওয়ার কারণে ১৮-১২-১৯৩৭ তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একে স্থায়ী রূপ দেয়ার নিমিত্তে ওয়াকেফীনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাতে গিয়ে ঘোষণা করেন :

"আগামীতে যেসব লোক নিজেদেরকে ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করবে তারা যেন ইহা বুঝে করে যে, নিজেদেরকে ফানা বা বিলীন মনে করতে হবে আর যে কাজে তাদেরকে লাগানো হয় পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে যেন সে কাজ করে। জ্ঞান-বুদ্ধির অনুমান করা তো আমাদের কাজ কিন্তু পরিশ্রম, আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সংকল্প তাকেই করতে হবে। অন্যদিকে এ খেয়ালও রাখতে হবে যে, ওয়াকফের অর্থ এই নয় যে, সে অকর্মণ্য মজুর প্রমাণিত হয়, আর ইহাও হবার নয় যে, আমরা তাকে বরখাস্ত করব না বা শাস্তি দেব না। সে-ই কেবল নিজেকে নিজে পেশ করুক যে শাস্তি জ্ঞান করতে পারবে। যে জাতি বা ব্যক্তির মধ্যে শাস্তি ভোগ করার শক্তি নেই সে সর্বদা ধ্বংস হয়েই থাকে।

সাহাবা (রাঃ)-দেরকে দেখ, কখনও কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাস্তি তাঁরা বরদাশ্‌ত করতেন আর স্বেচ্ছায় করতেন,.....অতঃপর ওয়াকফকারীদের জন্যে এ পাঁচটি গুণ ব্যতিরেকে ইহাও প্রয়োজন যে, তারা শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। পরে ইহা না বলা হয় যে, ঐ সময় তো আমি একটি চাকুরী পেতাম। অতঃপর ঐ ব্যক্তিই এগিয়ে আসুক যার নিয়্যত ইহা হোক যে, চেষ্টা করবো। যদি অকর্মণ্য প্রমাণিত হই তবে স্বেচ্ছায় শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য থাকবো।''

'আমি আশা করি যে, আমাদের যুবকগণ আমাদের উদ্দেশ্য পূরণার্থে এসব শর্ত মেনে শীঘ্র শীঘ্র নিজেদের নাম পেশ করবে যাতে এ পরিকল্পনাধীনে কাজ করতে পারেন। আমরা লোক তো খুব কমই নেব। হাজারের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই আমরা বেছে নেব। ৫/৭জনের মধ্য থেকে নেয়ার চেয়ে তারা অবশ্যই ভাল হবে। গতবার ২ শত যুবক নিজেদেরকে পেশ করেছিল আর এখন আমার ধারণা যে, তার চেয়ে বেশী পেশ করবে। যারা গতবার নিজেদেরকে পেশ করেছেন তারাও এখন পেশ করতে পারেন আর যারা কাজে নিয়োজিত আছেন তারাও পেশ করতে পারেন কেননা তারা তো ৩ বছরের জন্যে পেশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা মনে করতে পারেন যে, ৩ বছর তো আমাদের জানা ছিল না। যখন একবার নিজেকে পেশ করে দিয়েছেন তো পিছে ফিরে যাবেন কেন? তাদেরকে নিয়ম মত নাম পেশ করতে হবে কেননা প্রথমে আমাদের মোতালেবা ছিল মাত্র ৩ বছরের আর যারা নিজেদেরকে পেশ করবে দৃঢ় সংকল্প ও উদ্দেশ্য নিয়ে যেন করে।''

## ওয়াক্‌ফে জীন্দেগীর জন্যে নিয়ম কানুনঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) ১৯৫২ সনে নির্দেশ দেন যে, যারা ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গ) করতে চান তাদের নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবেঃ

(১) যাদের অধিক সন্তান-সন্ততি তাদের মধ্য থেকে যেন একজনকে ওয়াক্‌ফ করা হয়। আমরা অন্যের পথ বন্ধ করছি না তারাও ওয়াক্‌ফ করতে পারে তবে এ রকম নিয়ম জরুরী যে, প্রয়োজনবোধে সহজেই যারা পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে তারা যেন এ সুযোগ নেয়।

(২) ওয়াকফে জিন্দেগী অবশ্যই যেন সাবালক হয়। আগামীতে ২১ বছরের কম বয়সের লোক থেকে যেন ওয়াক্‌ফ গ্রহণ করা না হয়। পূর্বের ওয়াক্‌ফ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ যেন বন্ধ না করা হয়। ওয়াক্‌ফ যেন ছেলের হয়, পিতারও না হয় আর লোক দেখানোর জন্যেও না হয় বরং সত্যিকারের হয়।

(৩) একুশ বছর বয়সের পূর্বে যাদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হয়, অর্থাৎ জামেয়া আহ্‌মদীয়ার শিক্ষার্থীদেরকে যা দেয়া হয়, তা যেন কর্জ হিসেবে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ওয়াকেফীনের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের মধ্যে তা শামেল হবে আর ওয়াকেফ না থাকলে ইহা কর্জ হিসাবে গণ্য হবে এবং শর্ত অনুসারে আদায় করতে হবে।

(৪) প্রাক্তন ওয়াকেফীন, যাদের ব্যাপারে সেলসেলার অর্থ খরচ হয়েছে, তারাও নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অর্থ ফেরৎ দিয়ে অবকাশ নিতে পারেন।

(৫) যেসব পিতা-মাতা নিজ সন্তান-সন্ততিকে ওয়াক্‌ফ করতে চান তাদেরকে যেন অপেক্ষমান ওয়াকেফীনের তালিকাভুক্ত করা হয়। যখন তাদের বয়স ২১ বছর হবে তখন তাদেরকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা নিজেদের ইচ্ছায় জীবন ওয়াক্‌ফ করছে কি-না। যদি তারা ওয়াক্‌ফ না করতে চায় তাহলে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে আর যদি তারা ওয়াক্‌ফ করতে চায় তবে তাদের ওয়াক্‌ফ মঞ্জুর করা হবে (রিপোর্ট মজলিসে মোশাবেরাত: ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০)

## ওয়াক্‌ফে নও তাহরীক (নব উৎসর্গের ঘোষণা):

তাহরীকে জাদীদের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আজ আহমদীয়ত ছড়িয়ে পড়েছে এদিক সেদিক বিশ্বের চতুর্দিকের ১৩০টি রাষ্ট্রে। হাজার হাজার জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে। চতুর্দিক থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রবেশ করছে এ পবিত্র সিলসিলায়। এদের সঠিকভাবে তালীম ও তরবীয়ত দেয়ার জন্যে চাই অসংখ্য মুরব্বী ও মোয়াল্লেম। অদূর ভবিষ্যতে এ চাহিদা আরও বাড়বে—বেড়ে চলবে। সময়ের চাহিদাকে মিটাবার জন্যে তাই আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আই:) ১৯৮৭ সনের এপ্রিল মাসে একটি নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন যা "ওয়াক্‌ফে নও তাহরীক' নামে খ্যাত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী ২ বছরে আহমদীগণের নবাগত সন্তানদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করতে হবে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায়। তখন তিনি জামা'তের নিকট ৫০০০ শিশুর চাহিদা পেশ করেছিলেন (১০-২-৮৯ তারিখের খুতবায় দ্রষ্টব্য) পরে অবশ্য সময় সীমাকে ৪ বছর করা হয়েছিল। বর্তমানে ওয়াকফকৃত ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা দশ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

হুযুর কেবল ওয়াকফের ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি॥ কিভাবে তাদেরকে চাহিদা মত গড়ে তুলতে হবে সেজন্যে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করে পিতামাতা ও জামাতের ওপর যুগ্য দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আগামী ২০ বছরের মধ্যে দুনিয়ার সামনে আল্লাহ্‌র পথে মোজাহেদীনের একটি বিরাট দল সৃষ্টি হবে যারা তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করবে। তখন দুনিয়া তাহরীকে জাদীদের মহান সুফলের আরও বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পাবে ইনশাল্লাহ্‌।

## তাহরীকে জাদীদের রেজিষ্ট্রেশন:

১৯৩৮ সনের অক্টোবর মাসে তাহরীকে জাদীদের রেজিষ্ট্রেশন করা হয় আর তখন থেকে এর পূর্ণ নাম হয় তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। পরে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, পশ্চিম পাকিস্তান-এর অধীনে এ আঞ্জুমানের রেজিষ্ট্রেশন করা হয় ১৯-২-৪৭ তারিখে।

## তাহরীকে জাদীদের চাঁদার হার ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) প্রথম তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে নিম্নতম হার ধার্য করেছিলেন ৫/- (পাঁচ) টাকা মাত্র। ১৯৬৪ সনের ১৮ই মার্চ হুযূর (রাঃ)-এর আদেশক্রমে এর হার ধার্য করা হয় কমপক্ষে ১০/- (দশ) টাকা মাত্র। পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে নিম্নোক্ত হার ২৪/- (চব্বিশ) টাকা মাত্র নির্ধারিত হয়। আর আশা করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন এই তাহরীকে অংশ গ্রহণ করেন (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর ১৯৫৬ সনের জলসা সালানার বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)। এরপরে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানী সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয় যেন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিনি রীতিমত মাসিক আয় করেন তিনি যেন তার মাসিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ এই খাতে সাংবছর আদায় করার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক মোজাহেদ যেন নতুন বছরে ওয়াদা করার সময় পূর্ববর্তী বছরের ওয়াদার চেয়ে কিছু বাড়িয়ে ওয়াদা করেন কেননা মোমেনের পা সর্বদা আগে বেড়ে থাকে।

## তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ সনে নিজ পবিত্র কলমে তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জন্যে নিম্নোক্ত বিভাগ, (ওকালত) গঠন করেন : ১) ওকালতে মাল, ২) ওকালতে দেওয়ান, ৩) ওকালতে তালীম, ৪) ওকালতে তেজারত, ৫) ওকালতে সানয়াৎ, ৬) ওকালতে কানুন, ৭) ওকালতে তবশীর, ও ৮) ওকালতে ইশায়াত। পরে ওকালতের সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত ওকালত-গুলোও যোগ করা হয়— ১) ওকালতে উলিয়া, ২) ওকালতে যিয়াআত, ৩) দপ্তর আবাদী, ৪) সিগা আমানত ও ৫) অডিটর।

## তাহরীকে জাদীদ স্থায়ী কুরবানীসমূহের অন্যতম ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহরীকে জাদীদকে স্থায়ী কুরবানীসমূহের তাহরীক ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন—"এ তাহরীকের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়। ঐ সময় আসছে যখন আমাদেরকে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। দুনিয়া অর্থে আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সবার সাথে সংগ্রাম করতে হবে। কেননা প্রত্যেক জাতিতে ও প্রত্যেক দেশে ভদ্রলোকও থাকে। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, সব দেশে আমাদের পথ বন্ধ করার জন্যে প্রচেষ্টা চলেছে। তাই আমাদের সংগ্রাম শুধু হিন্দুস্থানে সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য দেশেও চলবে। আমাদের স্রষ্টা ও সত্যিকারের বাদশাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে হবে। যদি আহমদীয়াত কোন সমিতি হতো তাহলে আমরা ইহা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম যে, আমরা আমাদের প্রভাবের এলাকা সীমাবদ্ধ করে নেব আর যেখানে যেখানে আহমদী রয়েছে তারা নীরবে বসে যাবে। কিন্তু মুশকিল ইহা যে, আমাদেরকে

আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যে বাণী তার নিকট থেকে এসেছে উহাকে সমগ্র দুনিয়াতে পৌঁছে দিতে হবে আর আমাদের তা পৌঁছাতেই হবে। আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরী করিনি বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টি-কর্তা প্রণয়ন করেছেন।" (আল্‌ ফযল : ৩-১২-১৯৩৫)। পুনরায় তিনি বলেন,

"তোমাদের সামনে যে কুরবানীর সমুদ্র আসছে তাহরীকে জাদীদ তো তার এক গণ্ডূষ মাত্র। যে গণ্ডূষ দেখেই ভয় পায় সে সমুদ্রে কি দিবে।" (আল্‌ ফযল : ২-৭-১৯৩৬)

## তাহরীকে জাদীদের শান-শওকতপূর্ণ ভবিষ্যৎ ঃ

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখানো হয়—"একটি গভীর সমুদ্রের ন্যায় নদী যা সাপের মত এঁকে বেঁকে পূর্বদিকে যাচ্ছে পুনরায় দেখতে দেখতে পথ বদলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উল্টো বইতে শুরু করলো।" (আল্‌ হাকাম : ১৭-৪-১৯০)

বস্তুতঃ ইহা সেই মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের এক দৃশ্য যা ভবিষ্যতে শীঘ্র শীঘ্র তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর ফলে তাহরীকে জাদীদের পাঁচ হাজারী বাহিনীকে লাখে পৌঁছাতে হবে। আর পুনরায় পাশ্চাত্যের প্রতি দুনিয়ার যে দৃষ্টি তা ইসলামের নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। ইহা নিয়তির বিধান। ইহা হবেই হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একবার উদাত্ত কণ্ঠে বলেন—"যখন আমরা ইহা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, আমরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নাম দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেব আর ইসলামের প্রতাপ ও এর মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্যে নিজেদের সব কিছুকে কুরবানী করবো তো ঐ তবলীগি পরিকল্পনার জন্যে আমাদের যে অর্থ প্রয়োজন হবে তা পূরণ করাও আমাদের জামাতেরই অবশ্য কর্তব্য। সত্যি কথা বলতে কি সারা দুনিয়াতে সঠিকভাবে ইসলামের প্রচারের জন্যে আমাদের লক্ষ লক্ষ মোবাল্লেগ (প্রচারক) ও কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। যখন আমি রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকি তখন সমগ্র দুনিয়াতে তবলীগ বিস্তার দেয়ার জন্যে কখনও বলি আমাদের এত মোবাল্লেগ দরকার, কখনও বলি অত মোবাল্লেগ দরকার আবার কখনও বলি এত মোবাল্লেগ দরকার। আবার কখনও বলি এত মোবাল্লেগ দ্বারা কাজ হবে না, এর চেয়েও বেশী মোবাল্লেগ প্রয়োজন হবে। এ পর্যন্ত যে, কখনও কখনও বিশ লাখ পর্যন্ত সংখ্যা হিসেব করে শুয়ে যাই। আমার এ সময়ের ধারণা যদি রেকর্ড করা যায়, তাহলে মনে হয় দুনিয়া এ ধারণা করবে যে সবচেয়ে বড় 'শেখ চিল্লী' (গল্পের গোয়ালা যে অনেক অনেক কল্পনা করে) আমিই। কিন্তু আমার নিজস্ব অনুমানে আমি এত আনন্দ পাই যে, সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আমি কখনও চিন্তা করি যে, পাঁচ হাজার মোবাল্লেগ যথেষ্ট হবে, পুনরায় চিন্তা করি যে, পাঁচ হাজারে কি হবে, দশ হাজারের প্রয়োজন। আবার মনে করি দশ হাজার কিছুই নয়। জাভায় এত মোবাল্লেগের দরকার, সুমাত্রায় এত মোবাল্লেগের

দরকার, চীন ও জাপানে এত মোবাল্লেগ দরকার। পুনরায় প্রত্যেক দেশের জনগণের হিসাব করি আর বলি যে, এ মোবাল্লেগ খুবই কম এর চেয়েও বেশী মোবাল্লেগ দরকার। এরূপে বিশ লাখ মোবাল্লেগের সংখ্যায় পৌঁছে যাই। নিজের এই আনন্দের মুহূর্তে আমি বিশ বিশ লাখ মোবাল্লেগের প্রস্তাব করি। দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমার এ অনুমান কল্পনার চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে না। কিন্তু খোদাতা'লার নিয়ম এই যে, কোন জিনিস যদি একবার সৃষ্টি হয়ে যায় উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত তা ধ্বংস হয় না। লোক নিঃসন্দেহে আমাকে 'শেখ চিল্লী' বলুক কিন্তু আমি জানি যে, আমার এ ধারণা খোদা কর্তৃক সৃষ্ট ময়দানে রেকর্ড হয়ে চলেছে আর ঐদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আল্লাহ্ তা'লা আমার ধারণাকে বাস্তবতার রঙ্গে পূর্ণ করা শুরু করবেন। আজ নয় তো কাল থেকে ষাট অথবা একশ' বছর পরে খোদাতা'লার কোন বান্দা এরূপ হবে যে আমার এ রেকর্ডকে বাড়াবে যদি তার সৌভাগ্য হয় তো এক লাখ মোবাল্লেগ তৈরী করবে। পুনরায় আল্লাহ্তা'লা কোন এমন এক বান্দাকে দাঁড় করাবেন যে মোবাল্লেগের সংখ্যাকে দু'লাখে পৌঁছাবেন। এভাবে পদক্ষেপ আগে আগে বেড়ে আল্লাহ্তা'লা ঐ সময়ও নিয়ে আসবেন যখন সমগ্র দুনিয়াতে আমাদের ২০ লাখ মোবাল্লেগ কাজ করতে থাকবে। আল্লাহ্তা'লার নিকট প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সময় নির্ধারিত থাকে। এর পূর্বে কোন জিনিসের আশা করা বোকামী হয়। আমার এ ধারণাও এখন রেকর্ডে সংরক্ষিত হয়েছে এবং ইহা যুগ থেকে মিটে যেতে পারে না। আজ নয় তো কাল এবং কাল নয় তো পরশু আমার এ ধারণা বাস্তবে রূপ লাভ করবে"।

(আল্ ফযল: ২৮-৮-১৯৫৯)

## তাহরীকে জাদীদের সফলতার একটি চিত্র:

১৯৩৪ সনে আহরারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আহরাররা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে ধ্বংস করার ব্যাপারে এমনই নিশ্চিত ছিল যে, তাদের নেতা মৌ: আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী ঘোষণা করল যে, কাদিয়ানকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হবে যে, মির্যা মাহমুদ তার পিতার কবরও খুঁজে পাবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) তখন এক খুতবায় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি আমার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে, আহরারীদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আর অসংখ্য ফিরিশ্তা আমাকে সাহায্য করার জন্যে অবতীর্ণ হচ্ছেন। মহা পরিকল্পনার মালেক আল্লাহ্ তা'লা বোখারী সাহেবের দম্ভকে এমনভাবে ধূলিসাৎ করে দিলেন যে, আজ দুনিয়াতে আহরার আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই বল্লেই চলে। কাদিয়ান আজ এক নগরীতে পরিণত হয়েছে। শতবর্ষ জুবিলী জলসা উপলক্ষ্যে ইহা এক নব-বধুর সাজে সজ্জিত হয়েছিল। ১৮৯১ সনের সালানা জল-

সায় যেখানে মাত্র ৭৫জন যোগ দিয়েছিলেন সেখানে শতবর্ষ পরে যোগদান করেছিলেন ১৫ হাজার পুণ্যাত্মা। আজ সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি কাদিয়ানের দিকে। কাদিয়ান ধ্বংস করা তো দূরের কথা কাদিয়ান দিন দিন একটি আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

১৮৮৯ সনে কাদিয়ান থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা দশ দিক আলোকিত করে সারা বিশ্বের ১৩০টির রাষ্ট্রে আজ ছড়িয়ে পড়ছে। আর তাহরীকে জাদীদের পথ বেয়ে বেয়েই ইহা সম্ভব হয়েছে। দুনিয়ার কোন শক্তি আজ আর আহমদীয়াতের বৃক্ষকে উৎপাটিত করতে সক্ষম নয়।

আহরারীরা চেয়েছিল আহমদীয়াতের বাণীকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে কিন্তু আল্লাহ্‌-তা'লার পরম অনুগ্রহে আহমদীয়া জামা'তের খলীফার খুতবা, বক্তৃতা ইত্যাদি এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ৪টি মহাদেশে আজ ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এক থেকে এক কোটিরও অধিক লোক আহমদীয়াত তথা সত্যিকারের ইসলামে আলোকিত হয়ে এক কলেমা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর ঝাণ্ডার নীচে এক খলীফার হাতে সমবেত হয়েছে। তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশন, নুসরৎ জাঁহা রিজার্ভ ফাণ্ড, লীপ পরওয়ার্ড স্কীম প্রভৃতিও গঠন করা হয়েছে।

৪৬টি মুসলিম দেশের নেতা কেন পরাশক্তির কোন নেতারই এ সৌভাগ্য হয়নি যে, তার কথা যুগপৎভাবে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। কেবল জামা'তে আহমদীয়ার খলীফারই এই সৌভাগ্য হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। বিরাট সমাবেশ হজ্জের অনুষ্ঠানও আজ পর্যন্ত এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। কানাডার ম্যাপেলতে মসজিদ উদ্বোধনের সময়ে আমাদের চতুর্থ খলীফা (আইঃ) ঘোষণা দেন, হজ্জের দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করো তারপর দেখ হজ্জের অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে কেমনে প্রচারিত হয়। ইদানিং কালে পাকিস্তানের একটি আহলে হাদীস পত্রিকা ও দৈনিক ঝং আহমদীয়াতের প্রচার দেখে আফসোস করে লিখেছে যে—আমরা আহমদীয়া জামা'তের বিরোধিতা করে তাদেরকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছি!

কুরআন আমাদের জীবন। তাই কুরআন প্রচারের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৫৪টি ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর প্রকাশ করা হয়েছে। আরও ৪৬টি ভাষায় কুরআন মজীদের অনুরূপ তরজমা ও তফসীর যন্ত্রস্থ আছে যা অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, ইনশাল্লাহ্‌। বিষয়-ভিত্তিক কুরআন, বিষয়-ভিত্তিক হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক থেকে উদ্ধৃতিসমূহ সম্বলিত পুস্তক প্রায় ১৯৫টি ভাষায় ছাপা হয়েছে। এ ছাড়াও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন পুস্তকাদিসহ প্রচুর ইসলামী সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রাচুর্য আনয়ন করেছে।

পূর্বেই বলেছি আহমদীয়াত আজ পৃথিবীর ১৩০টি দেশে ছড়িয়ে গেছে। এসব দেশে মসজিদ, মিশন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ ও স্থাপন করা জামা'তের কাজ। এ পর্যন্ত ১২০০-এর বেশী মসজিদ বহির্দেশে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া শতাধিক স্কুল, কলেজ, কয়েক ডজন হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র জামা'তের পরিচালনাধীনে চলছে। এর অধিকাংশই চলছে আফ্রিকা মহাদেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায়

(অবশিষ্টাংশ ৬২ পাতায় দেখুন)

# মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও আহ্‌মদীয়া জামাতের কর্তব্য

—হযরত সাইয়েদনা মুস্‌লেহুলমাওউদ (রাঃ)

( এক )

"আমি এই প্রসঙ্গে যেখানে আপনাদিগকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, খোদাতা'লা আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামের মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছেন সেখানে আমি ঐ সকল দায়িত্বের প্রতিও আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যা আপনাদের উপর ন্যস্ত হচ্ছে। আপনারা আমার এই ঘোষণার সমর্থক, আপনাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য আপনাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনা, আপনাদের শেষ রক্ত-বিন্দুটুকুও ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের বিজয় ও সাফল্যের জন্যে দিতে প্রস্তুত হওয়া। কোন সন্দেহ নেই, খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন বলে আপনারা আনন্দিত হয়েছেন। বরং আমি বলছি যে, আপনাদের নিশ্চয়ই আনন্দিত হওয়া উচিত কারণ হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম নিজেই লিখেছেন "তোমরা আনন্দিত হও, আনন্দোৎ-ফুল্ল হও। এর পর এখন আলোক আসবে"। সুতরাং আমি আপনাদিগকে আনন্দিত হওয়ায় বাধা দেই না। অবশ্যই আপনারা আনন্দিত হোন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোন ও ঝম্প দিন। কিন্তু আমি বলি, এই আনন্দ, ও আনন্দ-ভরে ঝম্পে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব ভুলবেন না। স্বপ্নে খোদা আমাকে যেমন দেখিয়েছেন যে, আমি দ্রুত দৌড়িয়ে চলেছি এবং ভূমি আমার পায়ের নীচে হ্রস্বীভূত হচ্ছে তেমনি আল্লাহ্‌তা'লা এল্‌হামরূপে আমার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি দ্রুত—অতিশয় দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু এরই সাথে আপনাদের উপরও এই কর্তব্য এসে পড়ে যে, আপনাদের গতি দ্রুত করুন এবং আপনাদের মন্থরগতি পরিত্যাগ করুন।

ধন্য সে-ই, যে আমার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে এবং দ্রুত উন্নতির পথে চলে। আল্লাহ্‌তা'লা দয়া করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে অলসতা ও শৈথিল্য বশতঃ দ্রুত চলে না এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে মুনাফেকদের মত পশ্চাদাভিমুখী হয়। যদি আপনারা উন্নতি করতে চান, যদি আপনারা আপনাদের দায়িত্বকে যথার্থভাবে বুঝেন—তবে পায়ে পায়ে, স্কন্ধে স্কন্ধে মিশে আমার সাথে অগ্রসর হোন যাতে আমরা কুফরীর বুকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পতাকা স্থাপন করতে পারি এবং মিথ্যাকে চিরদিনের জন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে দূরীভূত করি আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এইরূপই হবে। যমীন আসমান টলতে পারে, কিন্তু খোদার কথা কখনও টলতে পারে না"।

[ ১৯৪৪ সনের সালানা জলসার বক্তৃতাংশ ]

( দুই )

"এই দায়িত্ব মানুষের শক্তিতে পালনের বহির্ভূত। এ জন্যে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা ছাড়া এখন কোনই গতি নেই। খোদাতা'লার কাজ খোদাতা'লাই করতে

পারেন। বান্দা করতে পারে না। যখন তিনি তাঁর কাজ বান্দার ওপর সোপর্দ করেন, তখন উহার দু'টি অবস্থা থাকে মাত্র। হয় তো বান্দা তার অলসতা, শিথিলতা ও আত্মম্ভরিতা দ্বারা কাজ নষ্ট করে এবং আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তুষ্টি আনে, যা তার প্রকৃত অবস্থাকে বুঝিতে পেরে আল্লহ্‌তা'লার হুযুরে প্রণত হয় এবং এমন নম্র হয়ে এতই ধৈর্যের সাথে তাঁকে ধরে যে, অবশেষে তাঁর দয়ার আবেগ আসে, তিনি সেই বান্দাকে তাঁর অঙ্কে তুলে নেন এবং তার বাহু ও তাঁর হাতে ধরে তার দ্বারা কাজ করিয়ে দেন। খোদা করুন, আমরা সকলেই এই দলভুক্ত হই এবং কোমর ভঙ্গকারী এই বোঝাকে কোন প্রকার পদস্খলন ব্যতীত গন্তব্যে পৌঁছতে সমর্থ হই। আল্লাহুম্মা, আমীন"। [ আল্‌ ফযল : ১৯৫২ সনের ২০ শে, ফেব্রুয়ারী ]

## মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করুন

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ মাওউদ দিবস। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এদিন আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এক মহান পুত্রের সুসংবাদ লাভ করেন। পরবর্তীতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) আল্লাহ্‌ কর্তৃক সুসংবাদ পেয়ে 'মুসলেহ মাওউদ' হবার দাবী করেন ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী। ধর্মের ইতিহাসে এ দিনটি খুবই গুরুত্ববহ। এ দিনের তাৎপর্যকে নতুন প্রজন্ম ও নবীনদের মাঝে সমুন্নত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর এদিনে শান ও শওকতের সাথে, আনন্দ ও উল্লাসের সাথে সভা-সমিতি, খেলাধুলা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়।

স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণকে এ বছরও যথারীতি ঐ দিনটি পালন করে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

( ৬০ পাতার পর )

৬০টি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে আর এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ইসলামের গৌরব গাঁথা গাওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশে আহমদীয়াত তথা ইসলামের প্রচারের সফলতা দেখে S.G. Williamson, University of Gold Coast তাঁর Christ or Mohammad পুস্তকে লিখেছেন — "That there is a challenge to the christian church can not be doubted" it is not yet decided whether the cross or the crescent shall rule over Africa. অনুরূপভাবে পশ্চিম আফ্রিকায় খৃষ্ট ধর্মের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এক প্রখ্যাত লেখকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—"I can make my verdict in the shortest of sentenses, I can make it in one word 'None" (Future of christianity to West Africa by Tai SOLARIM. published in the daily Times, Sept. 1961).

উপরোক্ত মন্তব্য তো আজ থেকে প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে করা হয়েছিল। আজ আহমদীয়াত সারা দুনিয়ায় আরও প্রসারতা লাভ করেছে—সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সবই তাহরীকে জাদীদের শুভ ফসল। তাহরীকে জাদীদের এ অগ্রযাত্রা চলছে—চলবে যতদিন যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ ও মাহদীয়ে মাসউদ (আঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী পূর্ণতায় পর্যবসিত না হয় :

"এই বীজ বর্দ্ধিত হবে, ফুল ও ফল প্রদান করবে প্রত্যেক দিকে এর শাখা প্রশাখা নির্গত হবে এবং মহামহীরূহে পরিণত হবে।" ( আল্‌ ওসীয়্যত : ২২ পৃষ্ঠা )

( সূত্র : তারিখে আহমদীয়াত )

# লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যুগ-খলীফার বাণী

প্রীতিভাজনেষু আন্তর্জাতিক লাজনা ইমাইল্লাহ্‌,

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের সংগে আল্লাহ্‌তা'লা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের পবিত্র ও গুরু দায়িত্ব আহমদীয়া জামা'ত এর উপর ন্যস্ত করেছেন।

কাজটি দুই প্রকার। প্রথমতঃ বস্তুবাদিতার বর্তমান ঝোঁক যা বিশ্ব-শান্তির প্রধান শত্রু তা প্রতিহত করা। আমরা যারা মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি তারা এই দায়িত্বও পেয়েছি যে, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিকে এই সত্য হৃদয়ংগম করাতে হবে যে, অন্ধ, স্বার্থপর, উন্মত্ত বস্তুবাদ এবং বিশ্ব-শান্তি কখনও সহ-অবস্থান করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় কর্তব্য হচ্ছে বিশ্ব-মানব গোষ্ঠীকে তার স্রষ্টার স্মরণাপন্ন করা এবং এই উদ্দেশ্যে তার দৃষ্টিকোণের আমূল পরিবর্তন সাধন।

আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের চাইতে আনন্দময় অভিজ্ঞতা আর নেই। তাঁর সাথে সম্পর্ক মানে আমরা আল্লাহ্‌র মাঝে অমর হয়ে থাকি এবং পার্থিব জীবন আর আমাদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে না। আমরা এক সুদূর প্রসারী দৃষ্টি লাভ করি এবং আমরা জীবনের এক নবতর তাৎপর্য আবিষ্কার করি। জাগতিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিবর্তে আমরা এই গভীর তত্ত্ব বুঝতে শিখি যে, আমরা তখনই সত্যিকারভাবে নিজেদের জন্যে বাঁচবো যখন আমরা পরের জন্যে বাঁচবো; আল্লাহ্‌র জন্যে বাঁচবো যখন আমাদের তুচ্ছ অস্তিত্ব স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা ও তাঁর অগণিত সৃষ্টির মাঝে বিলীন করে দিতে সক্ষম হবো।

কি চমৎকার ব্যবসা! আমরা এক ফোটার বিনিময়ে সাগরসম প্রতিদান লাভ করবো। হে ইসলামের সেবিকাগণ! আমার অনুরোধ তোমরা নিজেদের জীবন এই মহান কাজে উৎসর্গ করো।

ওয়াস্‌সালাম

তোমাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর—মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে'

# ওয়াকেফীনে নও শিশুদের বৈশিষ্ট্যাবলী

## ওয়াকেফীনে নও ও স্বঅভ্যেস

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেন :

"নিজের জ্ঞানের সীমার বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে ছোট বেলা থেকেই অভ্যেস করতে হয়। অনুমান সব সময়েই অনুমান—এটাকে এভাবেই বুঝাতে হবে। যদি ছোট বেলা থেকে এটা অভ্যেস না করা হয় তাহলে পরে এর সাথে খাপ খাওয়াতে খুব অসুবিধা হয়। অভ্যেসই তখন কর্তা হয়ে যায়। অভ্যেস থেকেই মানুষ এমন কথা বলে ফেলে যা তার বলা উচিত ছিলো না। এ ধরনের অক্ষমতাই পরে মানুষকে মিথ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ ধরনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটি আপোষমূলক মনোভাবও তৈরী হয়ে যায়।"

(জুমুআর খুতবা : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

## ওয়াকেফীনে নও ও নির্মল কৌতুক

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেন,

"কৌতুক করা ভাল। এগুলো সু-রুচিপূর্ণ হওয়া উচিত। অনেকগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন এমন দু'টি মূল্যবান কথা আমার মনে এসেছে। প্রথমতঃ নিজের বা অন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে কোন খারাপ কৌতুকের আশ্রয় নেয়া যাবে না। দ্বিতীয়তঃ এটা হতে হবে পরিশিলিত কৌতুক। একটি ভাল কৌতুক হল সাদাসিদে হাস্যরস। খাঁটি আনন্দ সব সময়েই বাঁধনে বাঁধা থাকে এবং এটা ততক্ষণই খাঁটি থাকে যতক্ষণ এটা তার আপন মহিমাকে ধরে রাখতে পারে। স্থূল ও কদর্য কৌতুক কখনো হালকা কৌতুক হতে পারে না। নিশ্চয় তা কুৎসিত ও হালকা আনন্দের বিপরীত"।

(জুমুআর খুতবা : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

## ওয়াকেফীনে নও ও স্বনির্ভরতা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেন :

আমি ইতিমধ্যে ঘিনা বা স্ব-নির্ভরতার বিষয়ে বলেছি। এটা হলো এমন একটি মানসিক অবস্থা যার শুরু আত্মতৃপ্তির গোড়া থেকে। এটা লিপ্সার বিরূপ মনোভাব থেকে নয় বরং দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা থেকেই আসে। ঘিনা গরীবদের অভাবের প্রতি অমনোযোগকারী হতে বলে না।

এটা বরং আপনাকে বাধ্য করে নিজের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে হলেও অন্যের প্রয়োজনের প্রতি মনযোগী হতে। এটাই হলো ইসলামী ঘিনার প্রকৃত তত্ত্ব যা সব সময় মনে রাখতে হবে। ওয়াকেফীনে নওদের হতে হবে দরিদ্রের প্রয়োজনের প্রতি মনযোগী এবং ধনীদের ধন-সম্পদ দেখে প্রলুব্ধ না হওয়া। এ অবস্থার সৃষ্টি হয় ধন-দৌলতের প্রতি বিতশ্রদ্ধা হতেই। কিন্তু ইহা আমাদেরকে গরীবের দুঃখে দুঃখী হতে উৎসাহিত করে"। (খুতবা জুমুআ : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

# শান্তির জন্যে শিক্ষা

মুহাম্মদ সেলিম খান

( ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ঘোষিত 'শিক্ষা সপ্তাহ এর শ্লোগান 'শান্তির জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে, পঠিত মূল নিবন্ধ )

আগামী শতাব্দীতে ২০১৯ সালের ২০শে জুলাই চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদার্পণ এর পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। ওই বিশেষ দিবসে পৃথিবীর মানুষ স্পর্শ করিবে মঙ্গলগ্রহের রক্তলাল মাটি। জ্ঞানে বিজ্ঞানে গবেষণায় আজকের মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণঘাতি ভাইরাস হইতে বৃহদাকার আমাদের সৌর জগতের সূর্যের চাইতেও ৫০গুণ বড়ো বড়ো সূর্যের ঝালর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষ জানিয়াছে তাহার শরীরের ৭৫ ট্রিলিয়ন জীবকোষের প্রতিটির কেন্দ্রিকতার অভ্যন্তরে ক্রোমোজোমের একুশ নম্বরে ৫৫ মিলিয়ন অক্ষর রহিয়াছে। আমরা এই জানাকে সাধুবাদ জানাই—সাথে সাথে সকল জানার একটি কল্যাণকর লক্ষ্যও আমরা সুনির্দ্ধারিত করিয়া দিতে চাই। তাহা এই জন্য যে, পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিকামী মানবাত্মা হইতে অনন্ত এক আকুল জিজ্ঞাসা এইসব বিস্ময়কর আবিস্কারকের কটাক্ষে ভরিয়া দিয়াছে তাহা হইলো-'শান্তির সেই মধুপুর কতদূর আর কতদূর' ?

তারকা যুদ্ধের ভয়ানক মহড়ায় পৃথিবীর আকাশ হইতে বহু পূর্বেই কল্পনায় গড়া শান্তির হইয়াছে নির্মম নির্বাসন, শক্তির দাপটে আধিপত্য ও প্রভাব বজায় রাখিবার স্বার্থে বিশ্বে শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতেছেন শক্তিধরেরা, জাতিগত বর্ণগত সাম্প্রদায়িক সংঘাতে দেশে দেশে শান্তির বড়ো অকাল, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুসমঝোতার দুর্ভিক্ষে গৃহের প্রাচীর চূড়িয়া শান্তির হইয়াছে অপারে পলায়ন, অতি চাওয়ার উচ্চাকাঙ্খায় মনো-হৃদয়ের লোভী-লাভার আসন ছাড়িয়া সটকে উড়িয়া গিয়াছে শান্তির শ্বেত-কপোত। তাই 'হেথা নয়, হোথা নয় অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে' শান্তির সতৃষ্ণ প্রত্যাশায় সর্বোন্নত মস্তিষ্কের দ্বি-পদ প্রাণী-গুলোর সতত সঞ্চারণ অহোরাত্র অবিরাম ॥ তবু হায়! শান্তির সন্ধান মিলিতেছে না কোথাও। হতাশার কালপীড়নে নত-ন্যুব্জ মানবাত্মার জন্য শান্তির কোন পথ কি আর খোলা নাই ? খোলা আছে—"হে শান্তির আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাহার প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ করো এবং প্রবেশ করো তুমি আমারই জান্নাতে (৮৯:২৮)।

প্রতিপালক স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য কি? অতি মুক্তবুদ্ধির প্রগতিবাদী বলিয়া ঘোষণা দানকারী কোন কোন বুদ্ধিজীবী ইহাকে হতাশার পরিণতিতে ধর্ম-তত্ত্বে-ভাবুকতায় অলস-নিষ্কর্ম আত্মসমর্পণ মনস্থ করিয়া হেয় দৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস চালান। অথচ ইসলামে বৈরাগ্য—বিবাগীর কোন স্বীকৃতি নাই। স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে—'তোমরা আল্লাহ্‌র রঙে রঙীন হও'—অর্থাৎ তাঁহার বিবিধ প্রশংসনীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার তাঁহার অন্যান্য সৃষ্টির মতো উদার অনাবিল হওয়ার এই কাজ বড়ো পরিশ্রমের, বড়ো সক্রিয় সাধনার। স্রষ্টার সূর্য যেমন সকল দেশের সকল প্রান্তর আলোকিত করে তেমনি স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া সমগ্র মানব জাতিকে প্রেম করিবেন, তাহার জ্ঞানের আলোকে উন্নত নীতির অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিবেন, পরোপকারের সুউন্নত পথ প্রান্তরের দিকে উদ্যোগী হইবেন ও অন্যদের করাইবেন। স্রষ্টার পৃথিবীর মতো সর্বংসহা হইয়া জগতের গ্লানি-বঞ্চনা, নির্যাতন লাঞ্ছনাগ্রস্থ মানবাত্মাকে প্রশান্তির স্বস্তিশয্যা পাতিয়া দিবেন। তিনি সুবিস্তৃত আকাশের মতো উদারতায় দুর্বল-অবল মানবের হীনত্বকে এড়াইয়া যাইবেন, ভালোবাসার আকর্ষণে উর্ধ্বে উঠাইবেন-শোধরাইবেন আচ্ছাদনকারী নিশার মতো স্খলিত মানবের কলঙ্ক-কালিমা ঢাকিয়া রাখিবেন। অতলান্ত সাগরের মতো হৃদয়ের ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিবেন—শত শত কান্না-আহাজারির অশ্রুধারা নিজ বুকে জমা করিয়া স্ফীত-ব্যথিত হইবেন-সেই জোয়ারের প্রতিটি বারিবিন্দু মানবতার কল্যাণ ফসলের সুউৎপাদনে উৎসর্গীকৃত হইবে। বিপুলা বনানীর মতো সুবাস-সুবাতাস আর ছায়া শোভা বিলাইবেন-নিজ সদ্ব্যবহার, আন্তরিকতা আর আন্তরিকতা আতিথেয়তায়—এই তো স্রষ্টায় প্রত্যাবর্তন। ইহার জ্ঞানগত উপলব্ধি ও আচরণে প্রতিফলনই ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। হ্যাঁ মানব কল্যাণকে সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য অনুষ্ঠান, গবেষণাও সমতালে চলিবে।

'ইসলাম' শব্দটি সল্‌ম' ধাতু হইতে উদ্‌গত এর অর্থ শান্তি। মানবজাতির জন্য স্রষ্টার মনোনীত চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ ধর্ম—শান্তির ধর্ম ইসলাম। এই শান্তির মূলবাণীই পবিত্র কুরআনে বিধৃত। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের বাহক এবং মানব জাতির শিক্ষক। চূড়ান্ত শান্তির লক্ষ্যেই তাঁহার সকল শিক্ষা দান। তিনি পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন এমন এক স্রষ্টার যিনি আস্‌সালাম—পরম শান্তিময় যিনি। পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা—'যাহারা ঈমান আনে এবং যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে' (১৩: ২৯)।

বর্তমান যুগে বিস্তৃত সেই মহান শিক্ষার সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করিতে, সেই পূর্ণ আদর্শের অনুশীলন আচরণার্থে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এক শ্রেষ্ঠ উম্মতিকে আল্লাহ্‌তালা ধরাধামে পাঠিয়েছেন। যিনি স্রষ্টার ইচ্ছায়, আদেশে ও অনুগ্রহে তাঁহার

জীবনালোকে মোহাম্মদী আদর্শের পূর্ণ-প্রতিফলনে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের সুস্পষ্ট দিশা দিয়াছেন। শান্তি-প্রিয় শান্তি-কামী-মানুষগুলোকে শান্তি-কর্মীতে পরিণত করিবার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। প্রতিশ্রুতি ছিলো তাঁহার পরে প্রতিষ্ঠা হইবে খেলাফতের—স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের বিশ্ব স্রষ্টার সুপরিকল্পিত কল্যাণময় ইচ্ছার মহান বাস্তবায়ন হইবে এই খেলাফতের মাধ্যমে। খেলাফতেরই অংগ সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া—আর এক কালজয়ী প্রতিশ্রুত সংস্কারক খলীফাতুল মসীহ সানী মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ১৯৩৮ সালে। ধর্মের মূল লক্ষ্য-স্রষ্টার রঙে রঙীন হইয়া মানুষের মঙ্গলে নিবেদিত হইবার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনে যেই বিপুল কর্মসূচী তাহাকে সহজ ও পদ্ধতিগতভাবে সম্পাদন করিতেই এই মজলিসের প্রতিষ্ঠা-খাদেমদের এই সংঘের প্রতিটি সদস্যই এক একজন প্রকৃত সেবক। এ বোধ ও বোধির বাস্তব জাগরণই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য-যেই লক্ষ্যের পরিণতি শান্তি প্রতিষ্ঠায়।

ইসলামী ইবাদতের প্রধান স্তম্ভ নামায। নামায বিশ্বাসীর সাথে তাঁহার স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ-এই সাক্ষাৎ অন্তে যেই অঙ্গীকার নিয়া স্রষ্টার সান্নিধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে—তাহা হইল ডানে ও বামে সালাম করা। এর মাধ্যমে প্রার্থনাকারী ডানপন্থী-বামপন্থী জগতের সকলের জন্য শান্তির অঙ্গীকার করিতেছেন—স্বয়ং স্রষ্টাকে সামনে রাখিয়া। দুই নামাযের মাঝে পৃথিবীতে বিচরণকালে চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেওয়া অর্থাৎ শান্তি কামনা করিবার এই যে শিক্ষা ও চর্চা অন্য কোন আদর্শ অথবা দর্শনে এর দৃষ্টান্ত কোথায়? অপর দিকে জাতি ও দেশগত বিভেদ নিরসনে সম্মিলিত আক্রমণে শান্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুকরণীয় অপরিহার্য শিক্ষা ও ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য।

অতএব স্রষ্টায় বিশ্বাসস্থাপন, তাঁহার সার্বজনীন রঙে রঙীন হওয়া, তাঁহার ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করা, কথা এবং কাজে সত্যিকার ঐক্য স্থাপনের যৌক্তিকতা অনুধাবন এবং উহার জ্ঞানগত উপলব্ধির ফলিত ধারণা প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের মধ্যে জন্ম দেওয়ার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি স্থাপন সম্ভব তাহা হইলেই জ্ঞান চর্চার সার্থকতা এবং শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হইতে পারে। অন্য কোন আন্দোলন, বিক্ষোভ, বর্ণাঢ্য-মিছিল কিংবা ক্ষণিক চেতনার বিপ্লবে শান্তির স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহতই থাকিয়া যাইবে—বিগত ইতিহাস তো আমাদেরকে তাহাই বলিতেছে।

—০—

# পবিত্র রমযান ও আমাদের করণীয়

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে কুশলেই আছেন। পবিত্র রমযান দ্বার প্রান্তে। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর মাস, বিশেষ করে ইহা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার ফযল, রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহন করে আনে। রমযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস আপনাদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হলো :

"হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যখন রমযান আসে, আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত হয় এবং জাহান্নামের দুয়ারসমূহ বন্ধ করা হয়। শয়তানদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় (অন্য বর্ণনায়—রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়)"।

—বুখারী, মুসলিম

"হযরত আবু হোরায়রাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তাহার পূর্ব গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানে নামায পড়ে তাহার পূর্ব গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রে নামায পড়ে, তাহার পূর্ব গুণাহ মাফ হইয়া যায়"। —বুখারী, মুসলিম

"উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকার্য দশ গুণ হইতে একশত গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। মহান আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, রোযা ব্যতীত, কেননা তাহা আমারই জন্য এবং আমিই উহার ক্ষতিপূরণ দিব। সে আমারই জন্য তাহার প্রবৃত্তি এবং খাদ্য ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ—এক আনন্দ ইফতারের সময় এবং একটি আনন্দ তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ মেশ্‌কের সুগন্ধি হইতেও আল্লাহ্‌র নিকট অধিক উত্তম। রোযা ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোযার দিন উপস্থিত হয়, সে যেন মন্দ কথা না বলে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার না করে। যদি তাহাকে কেহ তিরস্কার করে, সে যেন বলে, আমি রোযাদার"। —বুখারী, মুসলিম

"হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হয়, অনিষ্টকর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, এবং দোযখের দরজা বন্ধ করা হয়। সুতরাং ইহার দরজা খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, উহার কোনও দরজা বন্ধ রাখা হয় না। একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, হে মঙ্গল অনুসন্ধানকারী! সামনে আস। হে অনিষ্টের অনুসন্ধানকারী!

সংক্ষেপ কর। তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য দোযখ হইতে মুক্ত। ইহা প্রত্যেক রাত্রে ঘোষণা করা হয়"। —তিরমিযী

"হযরত আনাস-বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রমযানের প্রারম্ভে রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত। ইহাতে এমন এক রাত্রি আছে যাহা এক হাজার মাস হইতেও উত্তম। যাহাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহাকে সর্বপ্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্য লোক ব্যতীত আর কেহই ইহার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হয় না"। —মেশকাত

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট তাই দোয়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এই পবিত্র মাসে অধিক থেকে অধিকতর কল্যাণ ও বরকত লাভের সুযোগ দান করেন। কুরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও দান-খয়রাত করা প্রয়োজন। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। তিনি রমযান মাসে ঝড় তুফানের চেয়েও প্রবল গতিতে সদকা খয়রাত করতেন।

এই পবিত্র মাসে যাতে রীতিমত কুরআন শরীফের দরস দেয়া হয়, সেজন্যে মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাদের নিজ নিজ জামা'তে দরসের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবান তাদেরকে সাহায্য করবেন। যে জামা'তে কোন মুরব্বী বা মোয়াল্লেম নেই সে জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কুরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেকে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করে নাযেরা কুরআন পাঠ করতে সচেষ্ট হবেন। এ ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করেছেন তা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে খাকসারকে অবহিত করবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনা ব্যতিক্রমে যাতে রোযা রাখেন সে সম্পর্কে আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্নে তদারক করবেন। গ্রামবাসী যারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম তারা জামা'তের ফাণ্ডে কমপক্ষে ৩০০/-টাকা ফিদিয়া জমা দিবেন। এ ফাণ্ডের টাকা প্রয়োজনমত সম্যক বা একাংশ রোযা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে বন্টন করবেন। বাকী উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া তেজগাঁও, মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও নারায়ণগঞ্জ এর মত শহরে ফিদিয়া হবে কমপক্ষে ৩৫০ টাকা। আল্লাহ্‌তা'লা যাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করেছেন তারা নিজেদের অবস্থানুযায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এসব জামা'তের উদ্বৃত্ত ফিদিয়ার টাকা অত্র দপ্তরে পাঠাবেন। এবারকার ফিৎরানা মাথা পিছু ২৪/০০ টাকা ধার্য করা হল। অর্ধেক ১২/০০ টাকা।

অবস্থানুযায়ী প্রত্যেকের জন্যে পুরা বা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দেয়া যাবে। স্মরণ রাখবেন পবিত্র ঈদের দিন নামাযের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছে এমন শিশুর জন্যেও ফিৎরানা আদায় করতে হবে। যে জামা'তে ফিৎরানা গ্রহণ করার লোক নেই, অথবা ফিৎরানা বিতরণের পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সে টাকা অত্র দপ্তরে পাঠাবেন। এ ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে, মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হতে শতকরা ১০ ভাগের এক ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাতে হবে। অনুরূপভাবে যাদের যাকাত ফরয তারাও এ পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হবেন। মনে রাখা দরকার, যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। যাদের উপর ইহা ফরয তারা ইহা আদায় না করলে গুনাহগার হবেন। রমযান আমাদের জন্যে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের এক মহা সুযোগ আনয়ন করেছে। তাই পবিত্র মাসে আমরা যেন বেশী বেশী করে আল্লাহ্তা'লার তসবীহ্, তাহ্মীদ (পবিত্রতা এবং মহিমা) ঘোষণা করি।

সাধারণতঃ রমযান মাস নফল ইবাদত, যিক্রে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নামায তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কুরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, ইস্তেগফার, মাস্নুন দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে সর্বদা চেষ্টারত থাকবেন এবং জামা'তের উন্নতির জন্যে বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্র নামায বা-জামা'তের ব্যবস্থা করিবেন এবং জামা'তের সকল ছেলেমেয়েকে নিয়ে নামায পড়বেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামায বা-জামা'ত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহ্র নামায বা-জামা'ত আদায় করতে সচেষ্ট হবেন। স্মরণ রাখবেন, তারাবীহ্ নামায পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায়। মোটকথা রমযান মাসে রাত্রকে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে জাগরিত রাখাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত। এ বছর জামা'ত বড়ই সংকটের সম্মুখীন। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথে জামা'তের হেফাযত ও বিস্তারের জন্যেও সর্বদা দোয়া জারী রাখবেন।

রমযান মাসের শেষের ১০ দিনে হযরত রসূল করীম (সাঃ) ই'তেকাফ করতেন। ইহা বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামাতে যাতে বন্ধুরা এতে শরীক হন এর জন্যে এখন থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। রমযান মাসে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব যথা: কিশ্তিয়ে নূহ, ইসলামী নীতি-দর্শন, বারাকাতুদ্ দোয়া ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি যথা—আহমদীয়াতের পয়গাম, জযবাতুল হক, আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব প্রভৃতি পুস্তক-সমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (সাঃ)-এর খুতবা ও খুতবার ক্যাসেটসমূহ যথাসাধ্য শুনারও ব্যবস্থা করবেন।

বন্ধুগণকে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, রমযানুল মুবারকে বান্দার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। তবলীগ ও ইসলামের ময়দানে জামা'তের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্যে আপনারা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দোয়া করতে থাকবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সব বান্দাকে হেদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ার অন্ধকার দূর করে উজ্জল দিনের উদয় করেন। বিশেষ করে এই দোয়া করা উচিত যেন আমরা এই শতাব্দীতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ-ভাবে পালন করতে পারি। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবার সংকল্পে দৃঢ়তা দান করেন। পাকিস্তানের আহমদীগণের মঙ্গলের জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে এই পবিত্র মাসে বিশেষভাবে দোয়া জারী রাখবেন।

ইহা ব্যতীত আমরা একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাহলো মালী কুরবানী, যার জন্যে বিশেষভাবে এই পবিত্র রমযান মাসই উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি যে, এই পবিত্র মাসে প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী দিতে বিশেষতঃ যাকাত, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের সম্পূর্ণ চাঁদা ও ভারত-আফ্রিকা ফাণ্ড, ওয়াশিংটন মসজিদ ফাণ্ড, আফ্রিকার কতিপয় দেশের যেমন সোমালিয়া, ইউরোপের বসনিয়ার জন্যে বিশেষ সদকা ফাণ্ড এবং আমাদের মসজিদ-মিশন ও জরুরী ফাণ্ডে সাধ্যমত চাঁদা আদায়ে যত্নবান হবেন। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে রমযান শরীফে পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীদের নামের তালিকা বিশেষ দোয়ার জন্যে হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠান হবে।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখবেন যে, বর্তমান শতাব্দী ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং বন্ধুগণ ঐকান্তিকতার সাথে তবলীগের কাজ করবেন আর সাথে সাথে আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করবেন যেন তিনি অপূর্ব ঐশী সাহায্য ও উজ্জল নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে সেই গৌরবোজ্জল মহান কল্যাণবর্ষী বিজয় ও বিশ্ব-শান্তি আমাদিগকে অচিরে লাভ করার সৌভাগ্য দেন। বিশ্ব-মানব যেন মহামহিমাময় আল্লাহ্‌র গুণ-গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং হেদায়াতমণ্ডিত সুদিনের হাসি মানুষের মুখে ফুটে উঠে। আমীন। বাংলাদেশ জামা'তের হেফাযত, অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্যেও বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্‌তা'লা সকলের হাফেয ও নাসের হউন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# সংবাদ

## সুন্দরবন জামাতের সালানা জলসা সুসম্পন্ন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও বরকতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের ১২তম স্থানীয় সালানা জলসা গত ইং ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী রোজ বুধ ও বৃহস্পতিবার দারুত তবলীগস্থ মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। অনুষ্ঠানে খাতামান্নবীঈন (সাঃ), ওফাতে মসীহ (আঃ), সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ), খিলাফতের আবশ্যকতা, ইসলামের পুনর্জাগরণ ও জামাতে আহমদীয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দান করেন। সর্বজনাব এস, এম, আবু কাওসার, জি এম, মতিয়ার রহমান, মৌঃ মজিদুল ইসলাম, শেখ জোনাব আলী এবং সদর মুরব্বী মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব ও মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ সফরউদ্দীন ও ঢাকা থেকে আগত মেহমান জনাব ফজলুল করিম মোল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় উপস্থিতির গড় ছিল ৭০০ জনের অধিক এবং জলসায় যোগদানকৃত সকলকে নৈশ ভোজে শামিল করানো হয়।

জি, এম, মতিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি '৯৩

## তালীমি পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের প্রোগ্রাম মতে ২০ হতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৯৩ ষান্মাসিক তালীমি পরীক্ষা (১ম পর্ব) অনুষ্ঠানের জন্যে কেন্দ্র হতে প্রশ্ন প্রেরিত হবে ইনশাল্লাহ। মাসের নির্ধারিত পুস্তক এবং ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। স্থানীয় মজলিস পরীক্ষার খাতা নিরীক্ষণপূর্বক ৭ই মার্চের মধ্যে (প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম ৫টি) জেলা কায়েদকে পৌঁছাবেন। জেলা কায়েদ প্রাপ্ত খাতা নিরীক্ষণপূর্বক ২০শে মার্চের মধ্যে প্রত্যেক গ্রুপের ১ম ৫টি রিজিওনাল কায়েদের নিকট উহা পৌঁছাবেন এবং তিনি পুনঃ নিরীক্ষণপূর্বক তদনুরূপ সংখ্যায় ৭ই এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব আগষ্ট '৯৩তে অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় ইজতেমায় কৃতিত্ব লাভকারীগণকে পুরস্কার ও বিশেষ সনদ পত্র প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ সেলিম খান, মোহতামীম তালীম
মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ

## শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হয়

২৯শে জানুয়ারী '৯৩ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের তালীম ও উমুরে তোলাবা বিভাগের উদ্যোগে 'শান্তির জন্য শিক্ষা' শীর্ষক এক সেমিনার মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর-এর সভাপতিত্বে দারুত তবলীগস্থ হলরুমে জাঁক জমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সপ্তাহ '৯৩ এর উদ্দেশ্যে ও কার্যসূচীর বিবরণ দিয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী, সদর, মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ। অতঃপর মোহতামীম তালীম, জনাব মুহাম্মদ সেলিম খানের মূল প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং নাজির আহমদ ভূইয়া। সভাপতির ভাষণে ন্যাশনাল আমীর সাহেব বিশ্বশান্তির

লক্ষ্যে সার্বজনীন সচেতনতা, কথা ও কাজে শান্তিপ্রিয়তার গুণের বাস্তব প্রতিফলন, সর্বোপরি ইসলামের মহান নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা সপ্তাহের প্রোগ্রামের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপী তালীম তরবীয়তী ক্লাস, ইজতেমা-সেমিনার অনুষ্ঠান, লাইব্রেরী স্থাপন, বুকব্যাংক গড়ে তোলা, নিরক্ষর ও কৃতী ছাত্রদের তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি ছিল। এখন পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম কুমিল্লা, ভাতগাঁও, সৈয়দপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চান্দপুর, ঘাটুরা ও চট্টগ্রামে যথারীতি অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে।

মুহাম্মদ সেলিম খান, মোহতামীম
মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ

## বার্ষিক তালীমি ও তরবীয়তি ক্লাস ও ইজতেমা '৯৩ উদযাপন

আল্লাহতা'লার অশেষ ফযলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৪শে জানুয়ারী, '৯৩ হইতে ২৮শে জানুয়ারী '৯৩ বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

ক্লাশের দৈনিক কর্মসূচীর মধ্যে কোরআন শিক্ষা ও হাদীস শিক্ষার ক্লাস, নামায শিক্ষার ক্লাস, সিলসিলার কিতাব, তালীম তরবিয়তী ও তবলিগী মসলামসায়েল প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দৈনিক কর্মসূচীর মধ্যে সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে তালীম তরবিয়তী বক্তৃতা ও প্রশ্ন উত্তরের আসরও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। উক্ত ক্লাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আতফাল মোট ৬১ জন এবং খোদ্দাম ২১ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে আনসার সাহেবানও উপস্থিত ছিলেন।

সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম, এ,স এম, হাবিবুল্লাহ, শেখ আবদুল আলী, খন্দকার আনু মিয়া (স্থানীয় আমীর) খন্দকার ফারুক আহমদ, শাহজাদা খান, নাসির আহমদ, শামীম আহমদ, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ক্লাস পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন।

নাসির আহমদ, সেক্রেটারী
তালীম ও তরবীয়তি ক্লাস ও ইজতেমা '৯৩

## ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিবার্ষিক তালীম ও তরবিয়তী ক্লাস ও ৫ম বার্ষিক ইজতেমা সমাপ্ত

ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল ও আতফালুল আহমদীয়ার দ্বি-বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস এবং ৫ম বার্ষিক ইজতেমা গত ২৪শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার পর্যন্ত আহমদীয়া মসজিদে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে জাঁক জমক এবং বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

এস এম ইব্রাহীম, সেক্রটারী
ইজতেমা কমিটি '৯৩

# বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি

## ( মতামত সম্পূর্ণ লেখকের নিজের )

## কোন ব্যক্তির ধর্ম কি তা সে-ই ফয়সালা করবে

"ইদানিং একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক মহল আহমদী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য সরকারকে উস্কানী দিচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে এ সংক্রান্ত কোন আয়াতের উদ্ধৃতি বা ঘটনা উপস্থাপন করতে পারে না। যা দ্বারা কোন সরকার তাদের অমুসলিম ঘোষণা করার অধিকার রাখে। কুরআন ও হাদীসে জানা যায়, যে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করে সে-ই মুসলমান। অন্তরে প্রকৃত ঈমান আছে কি-না সেটা আখেরাতের ব্যাপার। সূরা হুজুরাত আয়াত ১৪তে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, কারও অন্তরে সত্যিকার ঈমান না থাকলেও সে নিজেকে মুসলমান ঘোষণা দিতে পারে।

যেমন যুদ্ধের ময়দানে উসামা (রাঃ) এক কাফের সৈনিককে মৃত্যুর মুখে কলেমা বলার পরও তিনি মৃত্যুর ভয়ে পড়ছে ভেবে হত্যা করলে রসুল (সাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন "তুমি কি অন্তর চিরে দেখেছিল যে অন্তর থেকে কলেমা পড়েনি ?" সর্বশ্রেষ্ঠ নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে অনেক মুনাফেক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কখনও কাউকে নির্দিষ্ট করে অমুসলিম বা কাফের বা মোনাফেক বলে আখ্যা দেননি। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দেয়া তো দূরে থাকে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি সেই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের দাবিদার ধর্মীয় রাজনৈতিক মহল বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কাজ অর্থাৎ আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সকল মহলকে সচেতন থাকার আহবান জানাচ্ছি"। মৌলানা আবুল এনাম সিদ্দিকী

পাচলাইশ, চট্টগ্রাম

(সাপ্তাহিক খবরের কাগজ-এর ১৯-১-৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

## আমরা কি সবাই কাফের ?

"পত্রিকান্তরে জানতে পারলাম গত ১৫ অক্টোবর তাহফুজে খত্‌মে নবুওত নামে একটি সংগঠন সংসদের ডেপুটি স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন কাদিয়ানী নামক সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য। মৌদুদী বাদের সমর্থক জামাতের সংসদ নেতা মতিউর রহমান নিজামী তাতে সমর্থন দিয়েছেন। এর ঠিক একদিন আগে ঘাতক—দালাল নির্মূল কমিটি সমাবেশে বাংলাদেশ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রেসিডেন্ট মাওলানা জাকির হোসাইন জামাতে ইসলামীকে জালেম ও কাফের নামে অভিহিত করে তাদের অমুসলিম হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়া বিভিন্ন ফের্কার বিভিন্ন আলেম একে অন্যকে বিভিন্ন সময় কাফের এবং অমুসলিম নামে ফতোয়া দিয়েছেন।

মাওলানা সাহেবদের এ অনিয়ন্ত্রিত ফতোয়ার সমস্যা হয়েছে আমাদের মত সাধারণ মুসলমানদের প্রত্যেকেই যদি একে অন্যকে কাফের এবং অমুসলিম নামে ফতোয়া দেয় তাহলে মুসলিম কে? সারা বিশ্বের দেড়শ' কোটি মুসলমানরা কি তাহলে সবাই কাফের এবং অমুসলিম"?

এন, এ, সিরাজী, ও, আর নিজাম রোড আ/এ, চট্টগ্রাম

( সাপ্তাহিক সুগন্ধা ঃ পৃঃ ২২, ১৪ নভেম্বর ১৯৯২-এর সৌজন্যে )

## কাদিয়ানী সমস্যা ঃ খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র

"'সুগন্ধা' ১৬ জানুয়ারী/'৯৩ (৬৩ঠ বছর, ১ম সংখ্যা) সংখ্যার 'অভিমত' কলামে আহমদ তারেকের "কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান" লেখাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য কোন কোন মাওলানা ও কিছু ধর্মীয় সংগঠন যে ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, বোধ হয় একটা কিছু অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়ছে না। উপমহাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের উপর অমুসলিম বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে খ্রীষ্টানদের হাজারো হাজারো নির্যাতনের মত সমস্যা থাকতে কাদিয়ানী সমস্যা আদৌ কোন সমস্যা কিনা বা কোন সমস্যার সৃষ্টি করা সঙ্গত কিনা তা সকলের গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন।

এটি সুকৌশলে মুসলিম বিদ্বেষী খ্রীষ্টানদের সৃষ্টও হতে পারে। কারণ আহমদীয়া জমাতের মিশন পৃথিবীর বিভিন্ন খ্রীষ্টান দেশে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দ্বারা খ্রীষ্টানরা দু'দিক লাভবান হবে; একদিকে খ্রীষ্টান দেশসমূহ তথা ইউরোপ, আমেরিকায় ইসলাম প্রচার স্তব্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে নির্যাতনের মাধ্যমে অতীঠ কাদিয়ানীরাই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (খোদা না করুন) খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে পারে।

তাছাড়া কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাদের অমুসলিম ঘোষণার পূর্বে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়টিকে আন্দোলনী নয়-হাক্কানী আলেমগণের দ্বারা সুরাহা করা যায়। প্রয়োজনমত কাদিয়ানী আলেমদের সাথে তারা বুঝপড়া করতে পারেন।

কাদিয়ানীরা যেখানে তাদের মসজিদের গায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখে রেখেছে, তারা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, কোরআন শরীফ পাঠ করে, সেখানে তাদের অমুসলিম ঘোষণার শরিয়তমতে জায়েজ বা কারো অধিকার আছে কিনা তা গভীরভাবে দেখার বিষয়।

হুযুগে-সুযোগে আন্দোলন করা বা কোন অঘটন ঘটার পূর্বে দেশের জ্ঞানী-গুণী আলেম সমাজের এবং সরকারের বিষয়টির ব্যাপারে সজাগ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি"।

আ, ন, ম, কামাল উদ্দিন

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,

চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম

## আনন্দ সংবাদ

আল্লাহতা'লার ফযলে বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের নিজস্ব ফ্যাক্স চালু করেছে। ফ্যাক্স নম্বর হল—৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

উল্লেখ্য যে, এই ফ্যাক্সটি ক্যালিফর্নিয়ার জামাত নায়েবে আমীর-৩ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবকে উপহার স্বরূপ গত নভেম্বর মাসে প্রদান করেছিল। জাযাহুমুল্লাহ।

## পুরাতন পত্রিকা চাই

আহমদী ৪৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা এবং ৪৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা যদি কোন গ্রাহকের কাছে থেকে থাকে তাহলে তা আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলে খুবই উপকৃত হব। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

নির্বাহী সম্পাদক
পাক্ষিক আহমদী

## সন্তান লাভ

আল্লাহ্তা'লার অশেষ ফযলে ও করুণায় গত ১৫ই ডিসেম্বর, ৯২ইং রোজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার সময় আমার ২টি জময পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে আল্হাম্দুলিল্লাহ। বর্তমানে আমার স্ত্রী ও পুত্র সন্তানদ্বয় ভালো আছে।

তাই আমি সমগ্র জামাতের সকল আহমদী ভ্রাতা ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি যেন আল্লাহ্তা'লা আমার পুত্র সন্তানদ্বয়কে এবং স্ত্রীকে সুস্থ রাখেন এবং সন্তানদের দির্ঘজীবি করেন ও খাঁটি খাদেম হওয়ার তৌফীক দেন। আমীন।

মোঃ কামরুল ইসলাম প্রধান
মোয়াল্লেম

আল্লাহ্তা'লার ফযলে গত ২৩-১-৯৩ দিবাগত রাত ৯-৩০ মিনিটের সময় আল্লাহ্তালা আমাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। (আলহামদুলিল্লাহ্) নবজাতকের মা ও সে কুশলে আছে। নবজাতক ও তার মায়ের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে জামাতের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

হাফেয মোহাম্মদ আবুল খায়ের
মোয়াল্লেম

## শোকসংবাদ

আমাদের শ্রদ্ধেয় আব্বা মৌঃ নাজাতউল্লাহ আহমদ প্রধান, অবসরপ্রাপ্ত মোয়াল্লেম দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ রোজ বুধবার দিবাগত রাত্র ২টার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বড় ছেলে হিসাবে মৃত্যুর ১ ঘন্টা পুর্ব (রাত ১টা) পর্যন্ত আমাকে অনেক নসিহত ও ওসীয়্যত করে যান। প্রথমতঃ জামাতের ছোট বড় সকল আহমদী ভাই-বোনকে তিনি আস্‌সালামু আলায়কুম জানিয়ে সকলের নিকট ক্ষমা চেয়েছেন। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী মৌঃ আহসান উল্লাহ পাটোয়ারী সাহেবকে ডেকে তাঁর অবর্তমানে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সকলকে দোয়াসহ বিভিন্ন কোরআনের আয়াত পেশ করে তরজমা সহ আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। তিনি তাঁর পরিবারে স্ত্রী, ২ (দুই) ছেলে, ৫ মেয়ে প্রায় ১৭ জন নাতী নাতনীসহ অনেক আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছেন। আহমদী ভাই-বোনের নিকট তাহার রূহের মাগফেরাতের জন্য এবং আমাদের শোকাহত পরিবারের সবাইর ধৈর্যসহ যাতে সান্ত্বনা পাই সেই জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের পুত্রদ্বয় গোলাম আহমদ প্রধান ও
রফিক আহমদ প্রধান

আমার ভগ্নীপতি মৌঃ ইয়াছিন নূরী সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগে ও হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রি ৪টার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে যান। মরহুমের নামাযে জানাযা মৌঃ হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেব পড়ান। স্থানীয় অনেক গয়র আহমদীও তাঁর জানাযার নামাযে শামিল হন। উক্ত শোকাহত পরিবারের ধৈর্য ও সান্ত্বনার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

রফিক আহমদ প্রধান
ইন্সপেকটর বায়তুলমাল

ঘাটুরা জামাতের প্রাক্তন সেক্রেটারী মাল মোঃ এরশাদ আলী মিয়া সাহেব গত ১৮-১-৯৩ ইং রোজ সোমবার রাত্র ৪টার সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। তিনি একজন মোখলেস প্রবীন আহমদী ছিলেন। তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা ও বহু নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভাইদের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ দুলাল মিয়া (ঘাটুরা)

১৮-১০-৯৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭টার সময় ক্ষুদ্রপাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব তমিজউদ্দীন সাহেব ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

তিনি ৬৬ বৎসর বয়সে ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে মারা গেছেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পরিবারের সকলকে সাব্‌রে জামীল দান করুন।

এম, ডি, নূরুদ্দীন
জেলা কায়েদ, দিনাজপুর

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"ইসলামের অভ্যুদয়ের ১৪০০ বছর পরেও বিশ্বের শতকরা আশি ভাগ মানুষ যখন ইসলামের শান্তি-ছায়া থেকে বঞ্চিত সেখানে শুধু মাত্র আহমদী মুসলিম জামাত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ" ইসলামের এই পবিত্র কলেমা প্রচার সহ ৫২টি ভাষাভাষি মানুষের মাঝে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ উপহার প্রদান এবং ১৩০টি দেশে ৪০০ কোটি অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে হাজার হাজার মসজিদ মাদ্রাসা তৈরী করে বিশ্বব্যাপী একটি মহা আধ্যাত্মিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত সে মুহূর্তে আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার দাবী কতটা যুক্তি সংগত বা ইসলাম সম্মত তা বিবেকবান তৌহীদি জনতার বিবেচ্য বিষয়।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী আজ বুধবার ১০ই ফেব্রুয়ারী ৪নং বকশী বাজার আহমদীয়া কমপ্লেক্সে তিনদিন ব্যাপী ৬৯তম সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানে সালাম, কলেমা, বিসমিল্লাহ, ইনশাল্লাহ, কোরআন তেলাওয়াতের অপরাধে আহমদীদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের তৎপরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম নির্ধারণের দাবী সরকার মেনে নিলে বাস্তবে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ফলে অনৈক্য ও অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করা হয়।

এ আধ্যাত্মিক জলসায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দেড় হাজারের অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দান করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

সম্পাদকীয়ঃ

## মুসলমানীর জামানত

কোরআন শরীফ পাঠে জানা যায় যে, সাধারণ আরববাসীরা যারা মরুভূমিতে বাস করত তারা কলেমা পাঠ করে বলত যে, তারা ঈমান নিয়ে এসেছে। এর উত্তরে আল্লাহ্-তা'লা বলছেন, '( হে নবী ) তুমি এদেরকে বল যে, তোমরা এখনও মুমেন হতে পার নি। তবে তোমরা মুসলমান হয়েছ মাত্র ( সূরা হুজুরাত : ১৫ আয়াত অবলম্বনে ) এথেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে তাকে অমুসলমান বলার অধিকার কারো নেই। 'কুলু আস্লামনা' দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা এই অধিকার প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন। তবে প্রকৃত মুমেন কে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। 'ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলিল ঈমানু ফি কুলুবিকুম' আয়াত দ্বারা একথাই বুঝায়।

মহানবী ( সাঃ ) একবার মুসলমানদের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, উকতুবু লিমাম ইয়ালফাজু বিল ইসলামে মিনান নাস—অর্থাৎ যেব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে স্বীকার করে তার নাম মুসলমান হিসাবে তালিকাবদ্ধ করে নাও ( বোখারী )। এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, সেই ব্যক্তিই মুসলমান যে নিজেকে মুসলমান বলে। যে নিজেকে মুসলমান বলে তাকে অমুসলমান বলার অধিকার কারো নেই।

মহানবী ( সাঃ ) বলেছেন, "যে আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলার অনুসরণ করে এবং আমাদের যবাই করা প্রাণী খায় সে মুসলমান। স্বয়ং আল্লাহ্ এবং রসূল এদেরকে মুসলমান হওয়ার জামানত দিচ্ছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের এই জামানত ভঙ্গ কর না ( বোখারী )। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন ফির্কার মৌলবী মোসলমানরা এই জামানত ভঙ্গ করে একে অপরকে কাফির বানিয়ে ছেড়েছে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি দলও নেই যার বিরুদ্ধে কুফুরী ফতোয়া নেই। একবা এক যুদ্ধে প্রিয় সাহাবী হযরত ওসামা (রাঃ) কলেমা পাঠরত বিপক্ষদলের এক সৈন্যকে হত্যা করেন। মহানবী (সাঃ) ঘটনাটি জানতে পেরে এ ব্যাপারে হযরত ওসামাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন। ওসামা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাবার জন্য কলেমাকে ঢালরূপে ব্যবহার করেছিলেন।' মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত রাগের সঙ্গে বললেন, আফালা শাকাকতা আন কালবিহী—অর্থাৎ তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছিলে যে, সে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই কলেমাকে ঢালরূপে ব্যবহার করেছিল? (মুসলেম) এথেকেও প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি মুখে কলেমা উচ্চারণ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে সে মুসলমান তাকে অমুসলমান বলার অধিকার কোন মৌলবী মোল্লা বা কোন সরকারেও নেই। আল্লাহ্ ও রসূলের এই জামানত যারা ভঙ্গ করবে তারা নাফরমানরূপে গণ্য হবে। আল্লাহর শাস্তি থেকে এরা কখনও রেহাই পাবে না।

( নির্বাহী সম্পাদক )।

আহ্‌মদী

15th Febuary, 1993

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

# আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury